জাতীয় সাহিত্য

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন সংস্করণ
জানুয়ারী—১৯৯৫

প্রকাশক :
সমীরণ চৌধুরী
কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

ভূমিকা

আমার পিতামহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চা ও অগ্রগতির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির জন্য ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতি আবশ্যক। স্যার আশুতোষের কয়েকটি ভাষণ "জাতীয় সাহিত্য" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল—শেষ সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত। আমি জেনে আনন্দিত হলাম "কলেজ স্ট্রীট" পত্রিকার প্রকাশন বিভাগ শ্রীমাধবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় "জাতীয় সাহিত্য" গ্রন্থটি পুনর্প্রকাশ করছেন। এই সংস্করণে স্যার আশুতোষের রচনার তালিকা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সম্পাদক মহাশয় ভাষণগুলির টীকার পরিমার্জন ও সংযোজন করেছেন। প্রস্তাবনায় সম্পাদক মহাশয়ের অভিমত বলাই বাহুল্য একান্তই তাঁর নিজস্ব।

১২৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৫
১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছিল গণিতশাস্ত্রের জটিল সমস্যার ওপর সমাধানমূলক প্রবন্ধ রচনা করে। দেশ-বিদেশের একাধিক গণিতবিষয়ক পত্র-পত্রিকায় সেই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। বিলেতের (কেম্ব্রিজ) 'মেসেঞ্জার অব ম্যাথমেটিক্স' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের ফলস্বরূপ স্যার আশুতোষ লাভ করেন এডিনবরার রয়াল সোসাইটির 'সভ্য' পদের মতো দুর্লভ সম্মান। এ'র পূর্বে কোনো বাঙালি এই সম্মানলাভ করেননি।

কলকাতা হাইকোর্টের আইনের পেশায় (জজিয়তি নয়) যখন স্যার আশুতোষ নিযুক্ত হন, তখনো আইনের সমুদ্রে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ করতে তিনি ভোলেননি। জটিল হাইড্রোডাইনামিক্স-এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্যে আশুতোষ অঙ্কপ্রেমী বিচারক জেমস্ ও কিনেলি (The Honourable Mr. Justice James O'Kinealy ; Puisne [পিউনি] Justice from January 1, 1882 to June 23, 1899 [Retired] ; but officiating until confirmed on October 18, 1880)-এর আদালতে জনৈক সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়ে দেন। স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠতনয় রমাপ্রসাদ এ-ঘটনার কথা বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন তাঁর 'Peep into the Past' রচনায় (দ্র. High Court at Calcutta Centenary Souvenir 1862-1962, PP. 217-218)।

এ-হেন গাণিতিক আশুতোষের অন্তরকে সাহিত্যরসের ফল্গু যে নিয়ত সিক্ত রেখেছিল, ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫ ইংগাব্দ) পূর্বে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি। এই সময় তিনি যুগপৎ হাইকোর্টের জজ (Puisne Justice from June 6, 1904 to January 1, 1924 [Resigned]; officiating until confirmed on August 11, 1906 ; acted as acting Chief Justice from Mareh 24, Wednesday 1920 to September 2, 1920) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (March31, 1906 to March 30, 1914 and April 4, 1921 to April 3, 1923)। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় : "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা হাইকোর্ট

—এই ছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি পক্ষ অথবা বিচরণভূমি, যাই বলি না কেন। আশুতোষের পাবলিক লাইফ এর বাইরে প্রায় শেষ পর্যন্ত কিছু ছিল না।" (দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, পৃ. ১১৮)।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ১৩২২ বঙ্গাব্দে আশুতোষ নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাস স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করার প্রেক্ষিতে দুটি পৃথক অভিভাষণ দেন। সেই অভিভাষণেই আশুতোষের অন্তরস্থিত সাহিত্যরসপিপাসু সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বতন্ত্রভাবে আশুতোষ সাহিত্য-চর্চা করার সুযোগ পাননি। কিন্তু বাঙলাভাষায় যে-ক'টি অভিভাষণ তিনি জীবদ্দশায় দেওয়ায় সুযোগ পেয়েছিলেন, তাতেই আশুতোষের সাহিত্য-প্রীতির সামগ্রিক রূপটি ফুটে উঠেছে।

বস্তুত, স্যার আশুতোষ নিজেকে আইনের পেশায় আমরণ নিযুক্ত রাখলেও বহু বিচিত্র বিষয়ের অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ-সংগ্রহ' ঘাটলে বোঝা যাবে সেখানে আইনের বই মাত্র এক তৃতীয়াংশ। বাকি অংশ সাহিত্য, ফাইন আর্টস ইত্যাদি বিষয়ের সংগ্রহে সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি স্যার আশুতোষের লেখা তিনখানি ডায়েরি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির রচনাকাল যথাক্রমে ১৮৮২, ১৮৮৩ এবং ১৮৮৬ ইংরাব্দ। ইংরেজিতে লেখা এই ডায়েরির পাতা থেকে জানা যাচ্ছে, আশুতোষ শেকসপিয়র-চর্চা যেমন করেছেন, পাশাপাশি সংস্কৃত-সাহিত্যের পাঠও নিচ্ছেন পণ্ডিত নিয়োগ করে।

এই বিচিত্রমুখী বিদ্যাচর্চা সত্ত্বেও আশুতোষের অন্তরকে কিন্তু কালাপাহাড়ি পাণ্ডিত্য স্পর্শ করতে পারেনি। এবং সেজন্যই তাঁর মতো অ-সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট সাহিত্য-আসরে 'সভাপতি' নির্বাচন করা হলেও তিনি নিজেকে কোনোদিনই স্রষ্টার পংক্তিতে দাঁড় করাননি। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বাঁকিপুর (পাটনা) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি স্পষ্টত বলেছেন: "আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি,—ইহা আমি

যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে চরিতার্থ হই।"

একাধিক সাহিত্য সম্মিলন ও সাহিত্য স্মৃতিসভায় 'সভাপতি' রূপে যে-অভিভাষণগুলি আশুতোষ দিয়েছিলেন, সেগুলি সংকলন করে 'জাতীয় সাহিত্য' নামে অধুনা দুষ্প্রাপ্য একটি গ্রন্থ তাঁর নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল জানা আজ কিঞ্চিৎ দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই সমস্যার একটা সাহিত্যিক সমাধান, প্রয়াসসাধ্য হলেও, দুষ্কর নয়। কারো কারো মতে, 'বইটি আশুতোষের মৃত্যুর পর প্রকাশিত।' (দ্র. দেশ/২৪ জুন ১৯৮৯ সংখ্যা, পৃ. ৩৬)। এই মতাবলম্বীদের যুক্তি হল : গ্রন্থটির সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তারিখবিহীন যে-ভূমিকা রয়েছে, (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশ / সাহিত্য সংখ্যা / ১৩৯০-এর ১৮ পৃষ্ঠায় স্বয়ং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোনো নথিপত্রের উল্লেখ ছাড়াই আলোচ্য রবীন্দ্র-অভিমতটিকে 'ভূমিকা' আখ্যা দিয়েছেন), তার রচনাকাল ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ ইংগাব্দ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আশুতোষ-বিষয়ক ফাইলে এই তারিখ আছে।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য অভিমতটি আদৌ 'জাতীয় সাহিত্য'-কে কেন্দ্র করে রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক অভিভাষণের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন। কবি তাঁর মন্তব্যে এই অভিভাষণটিকে 'প্রবন্ধ' আখ্যা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই অভিভাষণটি 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের অন্যতম সংকলন মাত্র।

সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠবে, যে-মন্তব্য সমগ্র গ্রন্থকেন্দ্রিক নয়, গ্রন্থের একটিমাত্র রচনাকে ঘিরে, সেই মন্তব্য 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হল কীভাবে ? এই প্রসঙ্গে কারো কারো ধারণা যে, আলোচ্য রবীন্দ্র-অভিমত সম্ভবত শ্যামাপ্রসাদকে লেখা কবির চিঠির অংশবিশেষ।

এই ধারণা হতে অনুমান করা বোধ হয় কষ্টকর নয় যে, 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থের ছাপার কাজ চলাকালীন আলোচ্য অভিভাষণটির একটি (মুদ্রিত) ফাইল-কপি শ্যামাপ্রসাদ কবির হাতে দিয়েছিলেন। কবি

পরবর্তীকালে পড়ে সে-সম্বন্ধে নিজের অভিমত চিঠির মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদকে জানান।

সম্প্রতি আমি জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ-সংগ্রহ' বিভাগে গিয়ে আলোচ্য পত্রাবলীর খোঁজ করি। কিন্তু সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা জানান যে, ওই চিঠি 'RARE' বিভাগে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে, চিঠিগুলি দেখা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, শ্যামাপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে দশখানি পত্র 'দেশ' / সাহিত্য সংখ্যা / ১৩৯০ (পৃ. ৬-১২)-তে মুদ্রিত হয়েছে, সেখানেও আলোচ্য ভূমিকার হদিশ নেই।

'জাতীয় সাহিত্য' যে ইংরেজি চল্লিশের দশকের গোড়ায় মুদ্রিত হয়, সে ব্যাপারে একটা বিষয়ে এতাবৎকাল আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি। আমরা রবীন্দ্রভবনে আশুতোষ-বিষয়ক ফাইল ঘেঁটেছি; কিন্তু দেখিনি যে, গ্রন্থের প্রকাশকালে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'সংক্ষিপ্ত বিবৃতি' নামে একটি টীকা-অধ্যায় রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই অধ্যায়ের ৮ এবং ৬১ নং টীকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে একস্থানে 'ত্রিশকোটি ভারতবাসীর' এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের এক জায়গায় 'সাতকোটি বঙ্গবাসী'র কথা যে বলেছেন আশুতোষ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র দুই স্থানে ১৯৩১ ইংরাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক লোকসংখ্যার উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ থেকেই স্পষ্টত আভাস মেলে যে, আলোচ্য অভিভাষণগুলি সংকলিত হয়েছিল ১৯৩১ ইঙ্গাব্দের পর।

প্রকৃতপক্ষে, 'জাতীয় সাহিত্যে'র প্রথম মুদ্রণ/সংস্করণ হয় ১৯৩২ ইংরাব্দে। এরপর দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৩৬, তৃতীয় ১৯৪১, পঞ্চম ১৯৪৯-এ। চতুর্থ মুদ্রণ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায়নি। জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ-সংগ্রহে' গ্রন্থটির প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম সংস্করণ রয়েছে। সেগুলির ক্যাটালগ নং যথাক্রমে A.C/B891·4404 M, A.C/B891·4404M(II) এবং A.C/B891·4404 M(III)। দ্বিতীয় সংস্করণটি রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (ক্যাটালগ নং 757·4/0829)। চতুর্থ সংস্করণের হদিশ আশুতোষ-পরিবারেও নেই। শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৯৪৯-এ পঞ্চম মুদ্রণের পর 'জাতীয় সাহিত্যে'র আর কোনো সংস্করণ হয়নি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণের প্রকাশক আশুতোষ-তনয় রমাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পঞ্চম মুদ্রণের প্রকাশক উমাপ্রসাদ। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এই রকম : পারিবারিক রীতি অনুসারে জীবিত বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে বড়দা (রমাপ্রসাদ) 'জাতীয় সাহিত্যে'র প্রকাশক হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম পঞ্চম সংস্করণে। এর কারণ মেজদা (শ্যামাপ্রসাদ) তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বড়দা হাইকোর্টের জজ। কাজেই, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই পঞ্চম মুদ্রণের প্রকাশক হতে হয়েছিল। প্রসংগত, রমাপ্রসাদ কলকাতা হাই-কোর্টের জজ নিযুক্ত হন ১৩ মে ১৯৪৮ ইংগাব্দে এবং জজের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইংগাব্দ পর্যন্ত। এই প্রেক্ষিতে অনুমান করাটা অসঙ্গত হবে না যে, 'জাতীয় সাহিত্যে'র চতুর্থ সংস্করণ/মুদ্রণ যা ১৯৪১ এবং ১৯৪৯-এর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই মুদ্রণ / সংস্করণের প্রকাশকও ছিলেন রমাপ্রসাদ।

'জাতীয় সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা ছিল ১৬৪, দ্বিতীয়তে ১৫০, তৃতীয়তে ১৬৮ এবং পঞ্চমে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮। আমার দেখা প্রতিটি সংস্করণেরই মূল্য ছিল ১ টাকা। এবং গ্রন্থটি আগাগোড়া 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়েছে। আলোচ্য প্রতিটি সংস্করণেই গ্রন্থের আখ্যাপত্র ছিল এইরকম : জাতীয় সাহিত্য / সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় / কলিকাতা / (এরপর যে সালে মুদ্রিত, সেই সালের উল্লেখ)। প্রসঙ্গত, 'জাতীয় সাহিত্যে'র একটি ইংরেজি এবং হিন্দি অনুবাদও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে (গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধিষদ্ (Senate)-সভায় বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেছিলেন : "It is our experience in this country that a large majority of those who are in public life have the good fortune or misfortune of wooing two mistresses at the same time – Law and Education. That was true of the late Sir Asutosh Mookerjee." (দ্র. ১৯৪৮ সনের ক. বি. অধিষদ্-কার্য-বিবরণ [Minutes], তাং ১৫মে ১৯৪৮, পৃ. ১৯১)। কিন্তু আমরা জানি, স্যার আশুতোষকে আরো একজন 'mistress'-এর মন সমান মর্যাদায় সিক্ত রাখতে হয়েছিল, তিনি সাহিত্য—বঙ্গসাহিত্য; এ-কে কেন্দ্র করেই স্যার

আশুতোষ 'ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্ব্বোচ্চ কামনার ও সাধনার' চিত্র এঁকেছিলেন। বলা বাহুল্য, 'জাতীয় সাহিত্য' সেই চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি।

পরিশেষে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থ সম্পাদনাকালে মূল অংশের বানান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

মাধবানন্দ ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ব্যক্তি : স্যার আশুতোষের তৃতীয় পুত্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষের পৌত্র তথা কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক শ্রীবঙ্কিমদরাম চক্রবর্তী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের-গ্রন্থাগার-কর্মী শ্রীরতনকুমার দাস। সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীসমীরণ চৌধুরী। শ্রীরামসদয় গঙ্গোপাধ্যায়। জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ-সংগ্রহ' বিভাগের কর্মিবৃন্দ। শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিষ্ঠান : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। মহাজাতি সদনের বিধানচন্দ্র গ্রন্থাগার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্। জাতীয় গ্রন্থাগার। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ (এঁদের সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হল ; এজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ)।

গ্রন্থ ও পত্রিকা : আশুতোষের ছাত্রজীবন (১৯২৪ ইংরাব্দ সংস্করণ) / অতুলচন্দ্র ঘটক। আশুতোষ স্মৃতিকথা / দীনেশচন্দ্র সেন। তে হি নো দিবসাঃ / সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে / রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য / শিপ্রা লাহিড়ী। কাব্যমঞ্জুষা / মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত / শান্তিদেব ঘোষ। পৌরাণিকা (২খণ্ড) / অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই / শিশির কর। ক্লাসিক চুটকি / মাধবানন্দ ভট্টাচার্য। রবিজীবনী (৬খণ্ড) / প্রশান্তকুমার পাল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস / গৌরীনাথ শাস্ত্রী। জাতীয় সাহিত্য (১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম মুদ্রণ)। মধুসূদন রচনা-বলী / হরফ প্রকাশিত। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (১৫ খণ্ড) / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত। ভারতকোষ (৫খণ্ড) / ঐ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল / ঐ। মহাভারত ও রামায়ণের চরিতাবলী / সুখময় শাস্ত্রী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত / আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। গীতা, চণ্ডী / উদ্বোধন প্রকাশিত। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ / আশা গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ (২খণ্ড) / হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিয়ার্স এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (১৯২৩ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ)। কলকাতা হাইকোর্ট শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ। হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'নস্টালজিয়া' (১৯৯৩ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষদ্ ও নিষদ্ কার্যবিবরণ।

দেশ (সাপ্তাহিক)। বিশ্বভারতী পত্রিকা। কলেজস্ট্রীট। মাসিক বসুমতী (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

এছাড়াও, যে-সব গ্রন্থ, পত্রিকা, ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান হতে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় সাহায্য পেয়েছি, অথচ যাদের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব হল না, তাদের সকলের প্রতিই আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ প্রকাশ করছি।

মা. ভ.

সূচীপত্র

'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্ব্বোচ্চ কামনা ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে এই কর্ম্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেচি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনা-শক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যা-নিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করেছিল। এই প্রবন্ধে সেই তাঁর মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটি দেখে সেই পরলোকগত মনস্বী পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

[১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

মা বঙ্গভারতী।

"তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি-রসে মগ্ন হ'য়ে রই।
যে ক'দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও-রাঙ্গা চরণতলে ॥"

—বিহারীলাল[১]।

এস মা, একবার দশভুজার রূপে আসিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরে দাঁড়াও এবং আশার স্নিগ্ধ অঞ্জনে বাঙ্গালীর চক্ষু মাজিয়া দাও ; তোমার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে তাহাদের মোহ কাটিয়া যাক, হৃদয়ে বল আসুক, অন্তরের অন্তস্তলে উৎসাহের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হোক—বাঙ্গালী দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া, আত্ম-পর ভুলিয়া, একপ্রাণে, একতানে সঙ্গীত ধরুক,—সে সঙ্গীতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাক, বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের আসন অধিকার করুক।

একদিন—সেই অতি প্রাচীনকালে—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও জগতে ফুটে নাই, বিশ্ব যখন একপ্রকার প্রগাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন, সেই আদিকালে—ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল, সেই গানে তখনকার ভারতের সর্ব্বত্র—"পর্ব্বত-পাথার, সমুদ্র-কান্তার" সমস্ত ভরিয়া গিয়াছিল—সেই এক সঙ্গীতের মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল,—শ্রৌতযুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সংঘবদ্ধ ভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড় স্পৃহণীয় মিলন, আর কি হইতে পারে না? সে বৈদিক যুগ নাই, সেই বিরাট্ বৈদিক সাহিত্য আজ অলঙ্ঘ্য হিমাচলের ন্যায়

ঐ পড়িয়া আছে,—ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন একপ্রকার অসম্ভব, একথা বলিলে চলিবে না। সেই হারানো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সেই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। কালের বশে চলিয়া আমাদিগকে কালজয়ী হইতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধকগণকে উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিতে হইবে—

"কে বলিল পুন পাবে না তায়?
হারানো মাণিক পাওয়া কি না যায়?
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রস্ত ছায়া ক'দিন রবে?
এ জগত-মাঝে ক'রো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয়;
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ আর কত দূর আছে;
ঐ দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে—
করহ সাধনা—পাইবে ফিরে॥"

—হেমচন্দ্র[২]।

একদিন যেমন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্মসাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্যকে সেইরূপ সমগ্র ভারতের আত্মসাহিত্য করিতে হইবে। জানি, এ কথায় হঠাৎ আস্থা স্থাপন করা বড়ই দুষ্কর; স্বীকার করি, কথায় যাহা বলা যায়, কার্য্যে তাহা পরিণত করা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে,—কিন্তু চেষ্টায় ত দোষ নাই। মানুষের সামর্থ্য যে কত, একদল মানুষ অথবা একটা মানুষ যে কত কাজ করিতে পারে, তাহা যদি মানুষ নিজে বুঝিতে পারিত, আত্মসত্তায় যদি মানুষ বিশ্বাস করিতে জানিত, তবে নরজাতির অবস্থা হয় ত আরও বিস্ময়-করী হইত, জগৎ মধুময় হইত।

আজ এক বার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইয়া রাখিয়া, ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টিসংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া একবার নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর স্রোতে মানসস্নান করিতে হইবে! শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিয়া শৌর্য্যবীর্য্যের সমাধিক্ষেত্র রাজপুতানার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে, আমার বঙ্গভারতীকে

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাজসজ্জায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারতসাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষাফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমি বাঙ্গালী যেমন মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞান-গরিমায় আমার মাকে সাজাইতে চাই, তেমনই আবার বাঙ্গালার মনীষা-সম্পদে তৎ তৎ প্রদেশ কি উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। একাকী দীর্ঘপথ চলা বড় দায় ও বিরক্তিজনক, দশজনকে লইয়া—আমার দেশী-বিদেশী সকল ভাইকে লইয়া—যাহাতে সেই বিরাট্ সারস্বত মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, সেই চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে। ক্ষুদ্র আপনাকে ভুলিয়া বৃহৎকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা—বিরাট্—তাহাতে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে[৩]। তবে ত মুক্তি। যত সংকোচ, বন্ধন তত কঠোর; যত প্রসার, মুক্তি তত সম্মুখে। বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে—বাঙ্গালার রামপ্রসাদের "মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল"[৪] ক্রন্দনের করুণস্বরে নিদ্রিত গুর্জরের[৫] চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতানার ভট্টকবির উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীতের সঞ্জীবন-মন্ত্রে বঙ্গসাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পূরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাঙ্গালার শ্যামা-দোয়েলের কূজনে রাজপুতানার ময়ূর কেকামৃত বর্ষণ করিবে, আবার গান্ধারের দ্রাক্ষারসে বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জ সরস হইবে। এক কথায়, এমন একটি সুখকর যান আবিষ্কার করিতে হইবে, এমন একখানি মনোহর বজ্‌রা গড়িতে হইবে, যাহার সাহায্যে ভারতের যে প্রদেশে যাহা কিছু উত্তম, মনোজ্ঞ, তাহা অন্য প্রদেশে অবাধে আমদানী করা যাইবে। যাহার যাহা ভাল, সকলেই তাহার আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, কালে—অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্প কালের মধ্যে—ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীয়

ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃত একাতপত্র সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হইবে। সে যে কি সুখের সাম্রাজ্য, সে যে কি মোহের সাম্রাজ্য, তাহা ভাবিতেও কতই না আনন্দ! এক চিন্তা এক ধ্যান এক জ্ঞান যাহাদের, এক দেবতা এক মন্ত্র এক পূজা যাহাদের, এক গান এক সুর এক তান যাহাদের, তাহাদের আবার অভাব কিসের? যদি এমনই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারি—সমগ্র ভারত যাহাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইবে যদি এমনই রত্ন উদ্ধার করিতে পারি—তবেই ত মায়ের প্রকৃত পূজা করিলাম,—অন্যথা মায়ের অবমাননা মাত্র। এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙ্গালী, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া, এক বিরাট্ সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তুমি-আমি চলিয়া যাইব, আরও কত আসিবে, কত যাইবে, কিন্তু যদি এই ভারতব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারি, অথবা ইহার বিন্দুমাত্র আনুকূল্যও করিয়া যাইতে পারি, আমাদের মর-জীবন সার্থক হইবে। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমি একা, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, এই সকল মনুষ্যত্ব-ঘাতী চিন্তা পরিহার করিয়া সিংহবিক্রমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধি নিশ্চিত। মনে রাখিও, যদি তোমার সংকল্প-শুদ্ধি থাকে, তবে তোমার সংকল্পের সিদ্ধিও নিশ্চিত। সুতরাং শুদ্ধ-সংকল্পে হৃদয় সবল করিয়া সাহিত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। দেখিবে, আজ যাহা ভাবিতেছ স্বপ্ন, কাল তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। দেখা যাউক, বাঙ্গালী আমরা এই সাহিত্য-সাম্রাজ্য-স্থাপনে কতটুকু সাহায্য করিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে একটা জিনিস দেখিতে পাই যে, কি মান্দ্রাজ বোম্বাই, কি গুজরাট বাঙ্গালা, সকল দেশের শিক্ষিত লোকেই ইংরাজীর দ্বারা পরস্পর কথাবার্ত্তা বা ভাবের আদান-প্রদান চালাইয়া থাকেন। বরোদার এক ব্যক্তি, যিনি বাঙ্গালার কিছুই জানেন না, তিনিও অবাধে ত্রিপুরার এক ব্যক্তির সহিত সুন্দর আলাপ করিতেছেন—পরস্পরের দেশীয় ভাষার অজ্ঞতা-নিবন্ধন, তাঁহাদের কাহারও কোন অসুবিধা হইতেছে না—বিদেশী ইংরাজী ভাষাই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘটকতা করিতেছে। এক হিসাবে ইংরাজী আমাদের বহুল উপকার করিতেছে। আজ যে ভারতে জগদীশচন্দ্রকে বা প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়াছি, তাহা ইংরাজীর প্রসাদে। রাজভাষা ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, করিবেও। সত্য বটে, পাশ্চাত্য ভাবের অনেক স্তর এ দেশের

মাটির সহিত খাপ খায় না, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ পশ্চিম দেশের ভাষা আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমাদের পরম উপকার হইয়াছে। অদৃষ্টবাদী আমরা, কর্ম্ম করিতে শিখিতেছি। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় আমরা কতদূর উপকৃত বা আমাদের দেশীয় ভাষা পাশ্চাত্ত্য ভাষার সম্পর্কে কতটা সম্পন্ন, তাহা অদ্যকার বক্তব্য নহে; অন্য এক উপলক্ষে আমি তাহা বলিয়াছি,[৮] সুতরাং আজ সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ ভাবের রাজ্য—প্রাণের রাজ্য। ভারতের কোন প্রদেশেই ভাবের অভাব নাই—মনস্বী মহাজনের অভাব নাই। উদ্ধবদাস-সুরদাস, রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস, মীরা-তুলসীদাসের[৯] ভারতে অভাব নাই। কেহ লোক-লোচনের সম্মুখে আসিয়াছেন, কেহ বা পল্লীকুঞ্জের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় জীবন কাটাইয়াছেন—দেশান্তরের লোকে তাঁহাকে চিনিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই এক একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং তাহা অতি প্রাচীন। সেই সমস্ত প্রদেশের অনেক অমর কবি, অনেক নিপুণ লেখক সেই সেই ভাষায় কত সুমধুর কাব্য, কত সুমধুর কথাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সেই দেশের অধিবাসীরা তৎ তৎ মহাকবির কাব্যামৃত-পানে কৃতার্থ হইয়াছে। ধরুন—যেমন কৃত্তিবাস বা চণ্ডীদাস, মাইকেল মধুসূদন বা হেমচন্দ্র, বঙ্কিম বা দীনবন্ধু[১০]। কে এমন বাঙ্গালী আছেন, যিনি ঐ সকল মহাকবির কাব্য পাঠ করিয়া, নিজে ঐ সকল কবির স্বজাতি বলিয়া শ্লাঘা অনুভব না করেন? বাঙ্গালার এমন কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহ আছে, যেখানে ঐ সকল কবির কোন-না-কোন গ্রন্থ গৃহের শোভাবর্ধন না করিতেছে? ঐ প্রকার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথাও ভাবুন। প্রত্যেক প্রদেশেই তাহার "নিজস্ব" বলিয়া কিছু-না-কিছু আছেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে এখনও নূতন, এখনও ত্রিশকোটি[১১] ভারতবাসীর মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করেন। যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট; সেই সাধারণ জন-সমাজ এখনও ইংরাজীর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় নাই। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে—সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে—সাহিত্যের ভিতর দিয়া যদি এক করিতে পারা যায়, তবেই ভারতে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, অন্যথা নহে। এখন এমন একটি সাধারণ সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহার উপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধিবাসীরা তাহাদের সর্ব্ববিধ বাধা-বিপত্তি পার

হইয়া এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পেঁাছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিবে না। অবশ্য কথা বড়ই কঠিন। দেখা যাক, ইহার সমাধান হয় কি না।

ভারতবর্ষে এখন সাধারণতঃ শিক্ষার কেন্দ্র দেখিতে পাই প্রকৃত পক্ষে একটি; তাহা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন যত কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে; যাহা আছে, তাহাও যায়-যায়। নবীনের সংঘর্ষে সে প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে—আর তাহার পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। এখন আর সে তেঁতুলের পাতার ঝোলে[১২] চতুষ্পাঠীর ছাত্র নির্ভর করিতে চায় না, বা অধ্যাপকও নির্ভর করাইতে পারেন না। সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সব ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ লোকে বোঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষিত বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী। অভিভাবক এখন স্ব স্ব বালকদিগকে স্কুল-কলেজে পাঠাইতে পারিলেই তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করিয়া থাকেন। দেশের সে চৌপাড়ি[১২(ক)] পাঠশালা ক্রমেই লোপ পাইতেছে, গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। শিক্ষা-সমাপ্তির পর যে কি হইবে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে সব চিন্তা না করিয়া ছেলেদিগকে স্কুল-কলেজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ, এই ভাবে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি চলিলে কোথায় যাইয়া যে ইহার কি পরিণাম দাঁড়াইবে, তাহা গুরুতর চিন্তার কথা। সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণ যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই শিক্ষা এই বর্ত্তমান প্রণালীতেই হওয়া উচিত, না অন্য কোন সমীচীন পথে শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হওয়া বিধেয়—সে বিষয় অদ্য আলোচ্য নহে। স্থানান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা বলিতেছিলাম—শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয়[১৩] আছে মাত্র। কিন্তু সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব।[১৪] যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। অন্যথা, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকিতে, এখন আবার

নূতন করিয়া আর একটা পথ খুলিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে। চাই আমরা কাজ—যে ভাবে যত সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সংজ্ঞা লইয়া বিতন্ডা করিলে চলিবে না, সংজ্ঞিত পদার্থ-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ভগবানের নাম করিয়া, দেশ-মাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব—মায়ের ছেলে আমরা, "মা মা" রবে অগ্রসর হইব—সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সভ্য মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক সঙ্কল্পে, এক উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সারস্বত সম্মেলনে সমবেত হইয়াছি; আজ গৈরিকস্রাবের ন্যায় আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে চাহিতেছে। আত্মগোপন করিতে আমি জানি না, কোন দিন করিও নাই; বিশেষতঃ আজ—এমন পবিত্র দিনে—মাহেন্দ্রক্ষণে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে যে—ঐ দেখুন, আমার হৃদয়ে আমি ভারতের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। এক ভাব, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে একতাবদ্ধ হইয়া, এক পরিবারের মত ভারতবাসীরা—হিন্দু-মুসলমান, পার্শি-খৃষ্টান—সকলে সর্ব্ববিধ মনোমালিন্য ভুলিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, বীণাপাণির মন্দিরে সমবেত হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে

"সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ"[১৫]

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে। বাঙ্গলার

"হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।"[১৬]

সঙ্গীত আমি যেন শুনিতে পাইতেছি, ঐ শুনুন—ভারতের অপর প্রান্তে সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; বাঙ্গালার শ্যামার ঔদাস্যপূর্ণ সঙ্গীত ঐ যেন রামেশ্বরের সিন্ধুতীরে মূর্চ্ছিত হইতেছে। আবার ঐ শুনুন—মহারাষ্ট্রের মধুর গীতলহরী বাঙ্গালাভাষার মধ্য দিয়া আসিয়া বঙ্গের প্রতিপল্লী মাতাইয়া তুলিতেছে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্ব স্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছিল, যাহার জন্য বাঙ্গালী কৃষক বা পল্লীবাসী উৎকলের বা দ্রাবিড়ের পল্লী-সঙ্গীত বুঝিতে পারিত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়—সুতরাং প্রাণের বিনিময়—

করিতে পারিত না, সেই ব্যবধান-প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর "পর পর" ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুর্জরের কণ্ঠ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব, স্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রস্রবণ ছুটাইতেছে।

আমি অনেক দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি। এখন প্রস্তুতের অনুসরণ করি।[১৭] বলিতেছিলাম, আমরা চেষ্টা করিব, ভারতে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাদের সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি কি না। আমি এ বিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্ম-সমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারতবাসীরা কোনও কাজে অসমর্থ—তা সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন। পারাঞ্জপে-গোখলে-রানাডে, রামমোহন-রবীন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল-জগদীশ-রাসবিহারী, বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-সুব্রহ্মণ্য[১৮] প্রভৃতির দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এ পর্যন্ত এমন কোনও কাজ ত দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। কাজ করিয়া আসিয়াছি, করিয়া যাইব। সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না, মানুষ ত কোন্ ছার! এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না—প্রকৃত পক্ষে, দিতে পারে না। "Friends and patrons cannot do what man himself should do"—কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে—দৈহিক বলের সামর্থ্য অতি অল্প—মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান্ হও, দেখিবে বিশ্ব তোমার সমক্ষে অবনত। একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখিবে জগৎ তোমার বশংবদ। কৈ, বনের পশু সিংহকে ত কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে না, সে কিন্তু নিজের মনের বিক্রমে সমগ্র পশুজাতির উপর রাজত্ব করিয়া থাকে।

"নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
বিক্রমৈর্জিতসত্ত্বস্য মৃগেন্দ্রতা॥
একো'হমসহায়ো'হং ক্ষীণো'হমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নে'প্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥"[১৯]

সুতরাং

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ ?"[২০]

একবার ঐক্য-বদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও—দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের ন্যায় একদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর—সাফল্য নিশ্চিত। এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত আমি কত-কি-না ভাবিতেছি! আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না—কেন না, যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চ্চা আপাততঃ উত্তেজনাজনক হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি—শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাব-গত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিয়া কি করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—কি করিয়া সমগ্রভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সুন্দর, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে. ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম, আমাদিগকে নিপুণভাবে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই ভাব-গত জাতীয় সাহিত্য-গত একতার সমাধান করিতে পারি।

যদি এই মহৎ কার্য্যের—এই দুঃসাধ্য কার্য্যের—সু-সম্পাদনের কোনও উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি যাহাতে বিদ্যার্থীরা প্রথমতঃ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্বলাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে; বি.এ., এম.এ. উপাধিমণ্ডিত বাঙ্গালী যুবক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে আরও দুই একটা ভারতীয় ভাষা—হিন্দি বা মারাঠি, উর্দ্দু বা তৈলঙ্গী ভাষা—শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে শিক্ষা-সমাপ্তির পর, সেই সকল যুবক পরকীয় ভাষার—অর্থাৎ ঐ হিন্দি বা মারাঠি ভাষা—সম্পদ-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় অনুক্রমিত করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র

উম্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উম্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও আপনি নৃত্য করে, তাহারা সেই উম্মাদনা বঙ্গভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে। বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন[21] আর বাঙ্গালা ভাষাতেই "অন্তরীণ" থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে।

শুধু এক প্রদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতির প্রবর্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই-মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষায় এম.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে, নতুবা মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পরিক "রেসিপ্রোক্যাল" ফলের সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষার এম এ. পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুই-চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই-চারিটি ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছুকাল পরে—বিশ পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে—আজ যেমন ইংরাজীতে বি.এ., এম.এ.-র অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, মতি-গতি সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। এক দেশের যে সাহিত্য উত্তম, এক দেশের যে কবিতা উত্তম, এক দেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য তাহা অন্য দেশের ভাষায় প্রবিষ্ট হইবে।

সুগম, সরল পথ প্রস্তুত করিতেই যত পরিশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে, যদি সে পথে আপদ্‌বিপদ্‌ না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোন দিনই হয় না। এখন ভারতবর্ষে এই ভাবে জাতীয় শিক্ষার কোন বিশিষ্ট পথ নাই ; যাহা আছে তাহা সমস্তই লুপ্‌ লাইনের মত বাঁকা পথ। এখন আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে কর্ড্‌, ক্রমে গ্রাণ্ড্‌-কর্ড্‌ ও পরে গ্রেট্‌-গ্রাণ্ড্‌-কর্ড্‌ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। জানি, এ পথ তৈরি করিতে অনেক ডাইনামাইটের প্রয়োজন, মনের উত্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক টানেল নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—কাজ বড়ই আয়াস-সাধ্য। কিন্তু তা বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তপস্যায় কি না হয়? অর্জ্জুনের পাশুপত-

অস্ত্র-লাভ[২২] যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহ্লাদের সমক্ষে স্ফটিক-স্তম্ভে নরসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব[২২(ক)] যে দেশের চিত্র, মৎস্যচক্র-ভেদ[২২(খ)] যে দেশের চিত্র, সে দেশে অসাধ্য কি?—যে দেশে অবসাদ কিসের? প্রারম্ভের পূর্বেই যত হিসাব-নিকাশ, যত ইতস্ততঃ; একবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, যদি মনের বল থাকে, তবে স্টিম রোলারের মত, সমস্ত উচ্চনীচ সমান করিয়া চলিয়া যাওয়া বেশী কথা নহে। তোমার পিতৃপিতামহের নিত্য জপের মন্ত্র একবার স্মরণ কর—

"একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে,
বলেন বৈ পৃথিবী স্থিতা বলং বাবতিষ্ঠস্ব।"[২৩]

এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম.এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই এম.এ. পরীক্ষার্থিগণকে প্রধানতঃ এক মূল ভাষায় ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্নপ্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে; অর্থাৎ যিনি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি বা মারাঠি বা তেলেগু বা গুজরাটি লইতে হইবে—এইরূপ, যিনি মারাঠি ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে আর একটি ভাষা লইতে হইবে। যদি যথার্থ অধ্যবসায়শীল উদ্যম সম্পন্ন কর্ম্মঠ যুবক পাওয়া যায়—অন্ততঃ বৎসরে একটিও মিলে—তবে দশ বৎসর পরে বাঙ্গালায় এমন দশ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা অবাধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আছে, তাহা আনিয়া প্রতিভার সাহায্যে বঙ্গভাষা খচিত করিতে পারিবেন, বাঙ্গালার সম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশীয় ভাষায় এম.এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে। ফলে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাব-গত একতার সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে, তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাব-সম্পদ্ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য-বন্ধনের সূত্রপাত হইবে। তখন আর দ্রাবিড়বাসীকে ইংরাজীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইবে না। নিজের নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কবিত্ব-সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে।

বঙ্গের সুলেখক হারাণচন্দ্র[২৪] বঙ্গভাষায় সংক্ষেপে মহাকবি সেক্স্পীয়রের

কাব্যাবলীর কতকটা ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন—ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া কি উক্ত কবিবরের কাব্যসৌন্দর্য্যের কতকটা উপভোগ করেন নাই? নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথের নাটকাকারে অনূদিত গ্রন্থ[২৫] পড়িয়া ও অভিনয় দেখিয়া কে না শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিল? বিদেশীয় কবির বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র পাঠেই যদি এতটা তৃপ্তি হয়, তবে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত স্বদেশীয় কবির গ্রন্থের তাৎপর্য নিজ মাতৃভাষায় পাঠ করিলে কতটা আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। অবশ্য আমার এই মতই যে অবিসংবাদী, ভ্রম-প্রমাদশূন্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে এইরূপই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে। আমি জানি, আমার এই প্রস্তাব কর্কশ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিবে না; আমি জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা উঠিতে পারে,—আবার সেই সঙ্গে আমি ইহাও জানি যে, কে কি বলিবে ভাবিয়া কোন কাজ করিতে গেলে আর কাজ করা হয় না।

"সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ।"[২৬]

এই কবি-বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরদিনের 'মটো'—

"ধিয়াত্মনস্তাবদচারু নাচরং
জনস্তু তদ্বেদ স যদ্বদিষ্যতি।"[২৭]

—আমাকে সর্ব্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে: সুতরাং যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। যদি কোন মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ষ-বিধানের অনুকূল কোন প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ করিব। নূতন পথে অনেক আবর্জনা থাকিয়া যায়, অনেক কণ্টক প্রথম চোখ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল করিতে করিতে তাহার উদ্ধার হয়। সুতরাং সাঁতার না শিখিয়া সাঁতরাইব না, এই বুদ্ধি ভাল নহে। ও-পারের ঐ সুন্দর নন্দনবনে যাইতে হইলে বাহুতে ভর করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। দু'চার বার হয়ত হাবুডুবু খাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না—ভরসায় বুক বাঁধিয়া সাঁতরাইয়া যাও, পারে পৌঁছিতে পারিবে! তখন তোমার সকল ক্লান্তি সকল শ্রান্তি দূর হইবে। শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ সুন্দর অঞ্চলে তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে।

এ স্থলে একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই: এ দেশে আজকাল ইংরাজীর বহুল প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক, সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্য্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকা-স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে আমার মাত্র দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম কথা—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয়-সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

দ্বিতীয় কথা—ইংরাজী ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক—ইতরসাধারণ—তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলেগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাঙ্গালার রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের[২৮] ভাব-সম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে ইংরাজীতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা ফল যে লক্ষগুণ অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে তরজমা করিয়া আমরা কয়জনে পড়িয়া থাকি, বা পড়িয়া প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে—সকলকে এক অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে—জাতীয় সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্য্যন্ত এক ঊর্ণনাভের জালে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথা একীকরণ অসম্ভব। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্য আছে তাহা এক বিরাট্ সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে—সমস্ত ভেদ মিটিয়া গিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখময়, স্বপ্নময় সঙ্ঘের গঠন হইবে। তবে এই মহৎ কার্য্যে মহা ত্যাগ চাই। বড় জিনিষ পাইতে হইলে খুব বড় রকমের

ত্যাগ আবশ্যক। যদি আমাদের সেই ত্যাগের সময় আসিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সে দিন আর দূরে নহে যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে অপর প্রান্তের প্রতিপল্লী সাড়া দিবে। আহা, সে অবস্থার কল্পনাতেও আমার কত-না সুখ, কত-না আনন্দ!

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে ঠিক ভাষা-গত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাব-গত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্রভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারত-প্লাবিনী বন্যার অবির্ভাব হয়, তখন সকল অবসাদ, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of language না হউক, unification of thought and culture নিশ্চয়ই জন্মিবে। সুতরাং সমগ্রভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লীতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে।— ইহা আমার স্বপ্ন নহে।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্রভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন-না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দি ভাষা সমগ্রভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃত-পক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্রভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য বাঙ্গালা ভাষা এত স্পর্দ্ধার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে!

অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক - সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক, শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে

কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেন-না যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য। জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প; কালের অক্ষয় শিলাফলকে তাহাদের কথা ক্ষোদিত থাকে না। তাহারা প্রাতঃকুজ্‌ঝটিকার ন্যায় অচিরকাল-মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগেরও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হউক। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণ-যোগ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে—নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশ-হিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে। আপনার ধর্ম্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত বা নীতি-সঙ্গত নহে।

আমার বক্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; আমার মনে এত ভাব আসিতেছে, কল্পনা আমাকে এত দূর-দূরান্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে যে, আমি আত্মসংযম বা আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না,—আর আমি আত্মগোপন করিতে শিখিও নাই। তথাপি অদ্যকার এই সাহিত্যের 'মহা-সম্মিলনে' আমি আর আপনাদিগকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি; বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্ধা করিবার আমি অধি-কারীও নহি, তথাপি ভালবাসিয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহারে বক্তব্য—বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুর্ব্বলকে কোলে তুলিয়া, সকলকে আপন করিয়া লইয়া এক পথে, এক যোগে যাত্রা করুন,—মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময়ে মনে মালিন্য রাখিতে নাই। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ। বহিঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম করিয়া

বাগ্‌দেবতার মন্দিরের সম্মুখীন হউন—এই আমার প্রার্থনা। মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল হস্তপদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করুন—এই আমার সবিনয় নিবেদন। মনে রাখিবেন—এই বিংশ শতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে, আপনাদিগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে; কেন-না, আপনারা জগৎ-ছাড়া নন। যাহা আজ স্বেচ্ছায় করিতে অনিচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইবে। ভগবানের

"কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ"[২৯]

বাক্য বিস্মৃত হইবেন না; আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন যে—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥"[৩০]

সভ্যগণ! স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে ভারতবর্ষের যে প্রাধান্য, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে মায়ের আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার ভারতভূমিকে সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানললামে বিভূষিত করুন। ত্রিশ কোটি কণ্ঠে একবার তারস্বরে "মা" বলিয়া ডাকুন,—মায়ের আসন টলিবে, মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন আবার নবীন উষার বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে, অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে। হৃদয়ে বল আনিয়া স্মরণ করুন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[৩১]

কিসের অবসাদ? কিসের সংশয়? কিসের সঙ্কোচ?

"কবি-রঙ্গ-ভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেথানে—যেথানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেথানে সরসী-সলিলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেথানে শরৎ-চাঁদের চাঁদিনী
গগন-ললাট ভাসায়ে রয়?
তবে মিছে ভয়, কেন রে সংশয়?

গাওরে আনন্দে পুরা'য়ে আশয়—
যেরূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দনবনে।"

—হেমচন্দ্র।[৩২]

উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১. সারদামঙ্গল / প্রথম সর্গ / ৩২ সংখ্যক কবিতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ' / চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৪ ইংগাব্দ / পৃ. ১১৪-এর সঙ্গে উদ্ধৃতিটি অন্বয় করে পাঠ করলে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিতে কতিপয় যতিচিহ্ন এবং বানানভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্যার আশুতোষ যে-সময়ে আলোচ্য অভিভাষণটি পাঠ করেন, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ ইংগাব্দ), সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'বিহারী-লালের কাব্য-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়নি। উক্ত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণ ১৯৩৯ ইংগাব্দে। অপরদিকে, বিহারীলাল ১২৭৭ বঙ্গাব্দে 'সারদামঙ্গল' রচনায় হাত দেন এবং ১২৮১ বঙ্গাব্দে 'আর্যদর্শন' মাসিকপত্রে তা প্রকাশিত হয়। ১২৮৬-তে (২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯) প্রথম গ্রন্থরূপ। ১৩০৭-এ 'সারদামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। আশুতোষ সম্ভবত প্রথমদিককার এই সংস্করণগুলির কোনো একটি হতে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি সংকলন করেছিলেন।

২. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭ এপ্রিল ১৮৩৮ / ৬ বৈশাখ ১২৪৫ জ. —২৪ মে ১৯০৩ / ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ মৃ.) 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা' নামক কবিতা হতে গৃহীত। কবিতাটির প্রথম প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৭৯ সংখ্যায় এবং ১২৮৩ বঙ্গাব্দে উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিতাবলী' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত।

৩. "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস-ইতি॥" ছান্দোগ্যোপনিষৎ / ৭ম অধ্যায় / ২৩ শ খণ্ড / ১ম শ্লোক। আবার, শ্রুতিতে আছে : "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

৪. সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের (আনুমানিক ১৭২৩ ইংগাব্দ / ১১২৯ বঙ্গাব্দ জ.—মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক তথ্য মেলে না। কেউ বলেন, রামপ্রসাদ

৮০ বছর জীবিত ছিলেন ; কারো মতে, এই জীবদ্দশাকাল ১০০ বছর। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত [ফাল্গুন ১৩৭৫ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০ ও ১২] 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' শীর্ষক পুস্তিকায় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নানা সূত্র যাচাই করে দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন যে, রামপ্রসাদের জন্ম ১৭২০ ইংগাব্দ / আশ্বিন ১১২৭ বঙ্গাব্দ। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র নিরুত্তর।) অন্যতম সাধনসঙ্গীত। "কেবল আসার আশা, ভবে আসা ; আসা মাত্র হলো। / যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো ॥ / মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল। / ওমা। মিঠের লোভে তেতোমুখে সারাদিনটা গেল ॥"

৫. গুর্জরগণ মধ্য এশিয়া হতে ভারতে আগত একটি অখ্যাত উপজাতি। অনেকে মনে করেন, হূনদের পরে এরা ভারতে প্রবেশ করে এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা হয়ে গুজরাতে বসতি স্থাপন করে। ভারতে গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিচন্দ্র। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মন্দর (যোধপুর)-এ প্রথম গুর্জর রাজ্য স্থাপিত হয়। হিউএন্-ৎসাঙ্ বর্ণিত কিউ-চো-লো গুর্জর দেশেরই নাম। তাঁর ভাষায় এর রাজধানী পি-লো মো-লো বা ভিল্লমাল। ভিল্লমাল হল বর্তমান ভিনমাল বা বাড়মের। এই বংশের নবম রাজা শীলুক ভট্টিরাজ দেবরাজকে পরাজিত করেন। শীলুক বা তাঁর উত্তরাধিকারীর সময়ে আরবগণ ভারত আক্রমণ করে যোধপুর রাজ্য দখল করে। কিন্তু অবন্তির রাজা প্রতীহার বংশীয় নাগভট আরবদের বিতাড়িত করে যোধপুরে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন। প্রতীহার নামে গুর্জরগণের একটি শাখা অবন্তিতে রাজত্ব করতেন। এঁদের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। এর রাজা প্রথম নাগভট আরবদের বিতাড়িত করে ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই প্রতীহার রাজগণের সময়েই গুর্জরদের শক্তি ও সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়েছিল। (দ্র. ভারতকোষ / তৃতীয় খণ্ড / পৌষ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ / পৃ. ১৬৬-৬৮)।

৬. **আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু** (৩০ নভেম্বর ১৮৫৯ জ.—২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ মৃ.) প্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্ ও জীববিজ্ঞানী। স্বনামধন্য 'বসুবিজ্ঞান-মন্দির'-এর প্রাণ পুরুষ। 'উদ্ভিদের প্রাণ আছে'—এই মতবাদের জনক।

৭. **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়** (২ অগস্ট ১৮৬১ জ.—১৬ জুন ১৯৪৪ মৃ.) বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ; 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক রাসায়নিক শিল্প

প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় প্রবর্তক। এঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ 'Life of a Hindu Chemist' এবং 'ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস'।

৮. ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত বাঁকিপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ 'বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' দ্রষ্টব্য।

৯. উদ্ধবদাস: প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস' নামে জনৈক পদকর্তা নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। আবার, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক উদ্ধব দাস আত্ম পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে যে, 'শ্রীরাধামোহন পদ, / যার ধন সম্পদ'। 'পদামৃত সমুদ্র'-সংকলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর এঁর গুরু; 'পদকল্পতরু'-র সংগ্রাহক বৈষ্ণবচরণ দাস এর বন্ধু। 'পদকল্পতরু'-তে উদ্ধব দাস নামাঙ্কিত ৯৯টি পদ আছে। এঁর অপর নাম কৃষ্ণকান্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া গ্রামে জন্ম।

চণ্ডীদাস: বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কবি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চন্ডীদাস' নামটিকে ঘিরে দীর্ঘদিনের এক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে। কিন্তু সেই চন্ডীদাস-ই সকলের আলোচ্য যাঁর পদ শ্রবণ করে শেষ জীবনে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর-বিরহ-ব্যাকুল অবস্থায় কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করতেন। কিন্তু সেই চন্ডীদাসের পরিচয় কী? এ-বিষয়ে অনেকেই গ্রন্থিমোচনে এগিয়েছেন। তবে এ-ব্যাপারে একটা নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক-সমাধানের সন্ধান মেলে শ্রীরামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চন্ডীদাস প্রসঙ্গে' গ্রন্থে। যে-গ্রন্থ পাঠ করে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রণেতা ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩/২/১৯৮১ ইংগাব্দে হস্তলিখিত এক বিচারে মন্তব্য করেছিলেন: "চন্ডীদাস সম্বন্ধে তাঁর (শ্রীরামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের) গবেষণা নতুন আলোকপাত করেছে।"

মীরা: পুরো নাম মীরাবাঈ (জন্ম আনুমানিক ১৫০৪ ইংগাব্দ— মৃত্যু আনুমানিক ১৫৬৩-৭৩ ইংগাব্দের মধ্যে)। যোধপুর রাজ্যের মেড়্তা তালুকের কুড়কী গ্রামে মীরাবাঈ-এর জন্ম। রাঠোর দুদাজীর পুত্র রতন সিংহের কন্যা। আবাল্য কৃষ্ণভক্ত, উপাস্যদেবতা গিরধর্‌লাল। রাণা সঙ্গের পুত্র কুমারভোজের সঙ্গে বিবাহ। বৈধব্যের পর নিয়ত সাধুসঙ্গ ও কীর্তনে মগ্ন। এই সময়েই মীরার পদাবলী রচিত। এই পদাবলীর ভাষা পশ্চিম রাজস্থানী। এতে মারোয়াড়ি, গুজরাতী, হিন্দি ও ব্রজভাষার প্রচুর শব্দ

আছে। (দ্র. ভারতকোষ / পঞ্চম খন্ড / শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ / পৃ. ৩৪৩)।

তুলসীদাস: হিন্দি-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি। এঁর বিশিষ্ট রচনা 'রামচরিত মানস'। তুলসীদাস তাঁর কাব্যের ভাগ করেছেন 'সোপান'-এ; কাণ্ডে নয়। কারণ 'রামচরিত মানস'-এর অর্থ হল রামচরিতরূপ মানস সরোবর যেখানে শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের মনোহংস যথেষ্ট বিহার করতে সক্ষম। কাজেই সরোবরে 'সোপান' থাকাই স্বাভাবিক। কাব্যটি অবধী অর্থাৎ পূর্বী হিন্দি ভাষায় রচিত। তুলসীদাসের দোঁহাবলী-ও উল্লেখযোগ্য রচনা। কিছু কিছু দোঁহা বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী হতে প্রচলিত।

সুরদাস: হিন্দি-সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম সাধক-কবি।

১০. মাইকেল: মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ / ১২ মাঘ ১২৩০ জ.—২৯ জুন ১৮৭৩ মৃ.)। কবি ও নাট্যকার। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'-এর স্রষ্টা।

দীনবন্ধু: দীনবন্ধু মিত্র (জন্ম ১৮২৯—মৃত্যু ১ নভেম্বর ১৮৭৩ ইঙ্গাব্দ) নাট্যকার ও বাগ্মী। এঁর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়েছিল।

বঙ্কিম: সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৭ জুন ১৮৩৮ / ১৩ আষাঢ় ১২৪৫ জ.—৮ এপ্রিল ১৮৯৪ / ২৬ চৈত্র ১৩০০ মৃ.)। নিষ্ঠাবান পদস্থ রাজকর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ' লেখার জন্য এঁকে ব্রিটিশ প্রশাসনের হাতে হেনস্থা হতে হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এঁরই সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও মননশীল প্রাবন্ধিক। শ্রেষ্ঠ রসরচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

১১. বক্ষ্যমান অভিভাষণটি স্যার আশুতোষ পাঠ করেছিলেন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ, ইংরেজি ১৯১৯ সালে। সেই হিসেবে ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী 'ত্রিশকোটি ভারতবাসী' লেখা হয়েছে। কিন্তু 'জাতীয় সাহিত্য' প্রথম প্রকাশের সময় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র একটি 'সংক্ষিপ্ত বিবৃতি' তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রাসঙ্গিক টীকায় ১৯৩১-এর আদম-সুমারীতে ভারতের লোকসংখ্যা যা ছিল (৩৫, ২৮, ৩৭, ৭৭৮), সেটার উল্লেখ

করেছেন। মনে হয়, এই তথ্যের উল্লেখ আলোচ্য অভিভাষণের টীকার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

১২. স্বল্পে-সন্তুষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণের আদর্শ বোঝায় আলোচ্য বাক্যে। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বুনো রামনাথ কৃষ্ণনগরের মহারাজকে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, তাঁর কোনো অভাব নেই; ক্ষেতে ধান আছে আর গৃহিনী তেঁতুলের ঝোল রাঁধেন—এতেই পরিতৃপ্ত। (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৪৯-এ খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রস্তুত 'সংক্ষিপ্ত বিবৃতি' সংখ্যা ৯, পৃ. ৮৭)। কিন্তু অপর এক সূত্র অনুযায়ী পূর্বোক্ত সংলাপ হয়েছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামনাথের স্ত্রীর মধ্যে। মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে রামনাথের স্ত্রী বলেছিলেন, "রাজা। আমার তো কিছুরই অভাব নেই, আমার পরিবার শাড়ী আছে, বাড়ীতে তেঁতুল (তিন্তিড়ী) গাছ আছে, তখন আর অভাব কিসের?" এবং রামনাথ মহারাজকে বলেছিলেন; "অর্থই অনর্থের মূল ও অধ্যয়ন-রিপু। অর্থ লইলে আমার বংশধরগণ ভোগ-বিলাসী ও মূর্খ হইবে।" প্রসঙ্গত, রামনাথের পুরো নাম রামনাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত। জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপে। 'অর্থ'কে ইনি 'কাক-বিষ্ঠা' মনে করতেন। এঁর রচিত গ্রন্থ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। (দ্র. বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী / হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ২৫৩-২৫৫)।

১২ (ক). চৌপাড়ি: সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধরনের বিদ্যালয়। চৌপাড়ি বা চৌবাড়ির অর্বাচীন সংস্কৃত নাম চতুষ্পাঠী। এক-একটি টোল বা চৌপাড়িতে এক-একজন অধ্যাপক থাকতেন। এবং তিনি যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মুখ্যত টোলে সেই বিষয়েই পড়ানো হত। টোলে পড়ার নির্ধারিত সময় ছিল না। সকাল-বিকেল অবসর মতো এক-একজন ছাত্রকে অধ্যাপক মহাশয় পড়াতেন। প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে পড়ানো বন্ধ থাকত। এই দুই তিথিতে ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে পড়ার বিষয়ে আলোচনা করতেন। পাঠ সমাপনান্তে অধ্যাপক মহাশয়ই ছাত্রকে উপাধি দান করতেন। সরকারি পরীক্ষার প্রবর্তন হলেও অনেকে পরীক্ষালব্ধ উপাধি অপেক্ষা গুরুদত্ত উপাধিরই অধিক সমাদর করতেন। (দ্র. ভারতকোষ / ৩য় খণ্ড /১ম সং / পৃ. ৬২০)।

১৩. ১৯১৯ ইংরাব্দ অবধি ভারতে যে-আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল,

সেগুলি হল : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৮৭), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬), মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭) এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮) ।

১৪. স্যার আশুতোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯২৪ ইংগাব্দের ২৫ মে। সেই সময় পর্যন্ত তৎকালীন ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্র অনুযায়ী 'এক এক প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়নি। অবশ্য অধুনা সে-স্বপ্ন সফল হয়েছে।

১৫. সরস্বতীর ধ্যানের শেষ চরণ "সমস্ত সম্পদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেবী সরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন।" মূল মন্ত্রটি এইরকম : "তরুণ—সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥"

১৬. দাশরথি ওরফে দাশু রায়ের পদ। তাঁর 'শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন' শীর্ষক পাঁচালী-পালায় আলোচ্য পদটি রয়েছে। (দ্র. কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দাশরথি রায়ের পাঁচালী ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ১২১)। পদটির পূর্ণবয়ান নিম্নরূপ :

"সুরট-(মল্লার)—ঝাঁপতাল

হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়। আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার,—ধর ধর জনার্দ্দন। পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সম্প্রীতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইষ্টে, এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশীবট-মূলে,
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি ॥"

১২১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (কৃষ্ণা চতুর্থীতে) (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

১৮০৬ ইঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে বাঁদমুড়া গ্রামে দাশরথি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেবীপ্রসাদ, মাতা শ্রীমতী দেবী। দাশরথি ত পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। স্ত্রী প্রসন্নময়ী; একমাত্র কন্যা কালিকাসুন্দরী ওরফে কালিকাদাসী। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২ কার্তিক (১৮৫৭ ইংগাব্দ) (কৃষ্ণা চতুর্দশীতে) ৫১ বছর ৯ মাস বয়সে দাশরথির মৃত্যু হয়। (দ্র. দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী / শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, (দোল পূর্ণিমা) ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৭৬-৮২ এবং ১২০—১২২)।

১৭. সংস্কৃতভাষার বাক্যভঙ্গির আদর্শে আলোচ্য পংক্তিটি রচিত। [প্রকৃতম্ (বা প্রস্তুতম্) অনুসরামি], 'প্রস্তুত' কথার অর্থ প্রারম্ভ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (২য়)। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র সেই বাক্য: "অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।" (দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী (৮ম খণ্ড) / প. ব. সরকার প্রকাশিত / জুলাই ১৯৮৬ সংস্করণ / পৃ. ৩৪১)।

১৮. পারাঞ্জপে: স্যার রঘুনাথ পুরুষোত্তম পারাঞ্জপে (জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬—মৃত্যু ৬ মে ১৯৬৬ ইংগাব্দ বিকেল চারটে)। পিতা পুরুষোত্তম কেশব পারাঞ্জপে। স্যার রঘুনাথের জন্মভূমি মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার মারুডি গ্রামে। ১৮৯৬ ইংগাব্দে বি এস সি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। জুন ১৮৯৯-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সেন্ট জনস কলেজ হতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিষয়ক সম্মান বিতরণী (ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাইপস্) পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করেন। এই সুবাদে 'সিনিয়র র‍্যাঙলার' ঘোষিত হন। ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসনতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত বোম্বাই প্রদেশ মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ১৯২১-২৩ ইংগাব্দ অবধি। উপাচার্য হন লখনৌ (১৯৩২-৩৮) এবং পুনা (১৯৫৬-৫৯) বিশ্ববিদ্যালয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত (১৯৪৪-৪৭)। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত নাইটহুড্ (১৯৪২) এবং কাইজার ই-হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি এস-সি উপাধি অর্পণ করে ১৯২১ ইংগাব্দে। (দ্র. Biographical Memoirs of Fellows of the Indian National Science Academy, Vol.-9, 1984 Edn., p. 29—33)।

গোখ্লে: গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে (জন্ম ১৮৬৬ ইঙ্গাব্দ-মৃত্যু ফেব্রুয়ারি

১৯১৫)। সর্বভারতীয় রাজনীতিক। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে জন্ম। এ'রই প্রসিদ্ধ উক্তি: 'What Bengal thinks today, India will think tomorrow'. পুনা শহরে মৃত্যু।

রাণাডে: মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২ ইংগাব্দ জ.—১৯০১ ইংগাব্দ মৃ.)। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার বিফাদ গ্রামে জন্ম। সমাজ-সংস্কারক। ১৮৭৪-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বায়ত্বশাসনের জন্য আবেদন করেন। তবে বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৮৯৩ ইংগাব্দ হতে আমৃত্যু বোম্বাই হাইকোর্টের জজ।

রামমোহন: রাজা রামমোহন রায় (২২ মে ১৭৭২ জ.—২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ মৃ.)। ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক অগ্রদৃষ্টিমান্ চিন্তানায়ক ও কর্মী। প্রাচীন বর্ধমান জেলার (বর্তমান হুগলির) ভুরশুট পরগণার রাধানগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত ফরুখশিয়রের আমলে বাংলার সুবেদারের আমিন থাকাকালীন 'রায় রায়ান' খেতাব পান। সেই বংশধরদের পদবী হয় 'রায়'। পিতা রামকান্ত, মাতা তারিণী। সতীদাহ প্রথা রদ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক। দিল্লির বাদশাহের নিকট হতে 'রাজা' উপাধি পান। ইংলন্ডের ব্রিস্টলের নিকটবর্তী স্টেপ্‌ল্‌টন্‌হিল গ্রামে মৃত্যু। সেকালে এ'রই সাহসী উক্তি: 'সংস্কৃত কলেজ করিবার আবশ্যক নাই· আমাদের ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিখিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ / ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ জ. —৭ আগস্ট ১৯৪১ / ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ মৃ.)। বিশ্ববরেণ্য কবি। সাহিত্য-শাখায় এশিয়ায় একমাত্র নোবেল প্রাপক। স্বদেশী আন্দোলনের প্রকাশ্য উৎসাহদাতা। বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ। স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন কবির রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচিতে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং নোবেল প্রাপ্তির পর কবিকে সাম্মানিক ডি. লিট্ প্রদান নিয়ে ভ্রান্ত কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০/১২ আশ্বিন ১২২৭ জ.—২৯ জুলাই ১৮৯১/১৩ শ্রাবণ ১২৯৮ মৃ.)। উনিশ শতকের মেরু-

দন্ডী ব্যক্তিত্ব। বিধবাবিবাহ আইনের প্রবর্তক। বাল্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রভূত সংগ্রাম করেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষার বিস্তারে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহার তিনিই প্রথম শেখান। ১৮৯১ ইঙ্গাব্দে সরকারের আনা 'সহবাস সম্মতি বিল'-এর বিরুদ্ধে (১৬-২-১৮৯১) তিনি ঋজু ভাবে বলেছিলেন : "I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses." (দ্র. বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার, ১৩০২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ ৬৩৩-৩৮)।

রাসবিহারী : স্যার রাসবিহারী ঘোষ (জন্ম ১৮৪৫ ইঙ্গাব্দে / ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ মৃ.)। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। তাঁর 'The Law of Mortgages' আজো ভারতবর্ষের রেহান আইন সম্পর্কিত প্রামাণ্যগ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য ১৯১৩ সালে ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯১৯ সালে ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা দান করেন। বয়সে প্রায় ৯ বছরের কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্যার আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদের বন্ধু ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি করার প্রাক্কালে স্যার আশুতোষ এ'র অধীনেই 'আর্টিকেল ক্লার্ক" ছিলেন। স্যার আশুতোষের বিধবা কন্যা কমলার পুনর্বার বিবাহের সময় (১৯০৮) বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে আশুতোষের যে-সংঘটের উপক্রম হয়, তার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য স্যার রাসবিহারী উদ্যোগ নেন। (দ্র. গুরুশিষ্য / উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেশ—৪ এপ্রিল ১৯৮৭ সংখ্যা, পৃ. ৩৭—৩৮)।

বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ জ.—৪ জুলাই ১৯০২ মৃ.)। পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কর্মবীরের প্রকৃত আদর্শ। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন ; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে জীবনকে নতুন আলোকে পর্যবেক্ষণ করেন। বস্তুত, তাঁর চেষ্টাতেই বিশ্বের দরবারে (চিকাগো ধর্মসভায়) লুপ্ত হিন্দুধর্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অপর কীর্তি।

সুরেন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৪৮—মৃত্যু ১৯২৫ ইঙ্গাব্দ)। দেশ বিশ্রুত রাষ্ট্রনেতা, বাগ্মী। 'ভারত সভা'র (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের) প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত 'বেঙ্গলী' দৈনিকের সম্পাদক। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'A nation in the making'.

সুব্রহ্মণ্য : সুব্রহ্মণ্য ভারতী (জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৮৮২—মৃত্যু ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ ইংরাব্দ)। তামিল ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। জাতীয় মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জন্মস্থান তিরুনেলবেলির এট্টেয়াপুরমে। পিতা চিন্নস্বামী আয়ার। সাত বছর বয়সে কবিতা রচনা আরম্ভ। সম্পাদনা করেছেন 'স্বদেশমিত্রন্' ও সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া'র। মাসিক 'চক্রবর্তিনী' প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ১৯০৫-এ কংগ্রেসের বারানসী অধিবেশন থেকে মাদ্রাজ ফেরার পথে কলকাতার দমদমে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

১৯. বনে সিংহের অভিষেক, সংস্কার (দশ সংস্কার অনুষ্ঠিত) হয় না। মৃগেন্দ্র (সিংহ) নিজেই তার বিক্রম অর্জন করে। (দ্র. হিতোপদেশে সুহৃদ-ভেদের ১৬ শ শ্লোক)।

মৃগেন্দ্র স্বপ্নেও কখনও এরূপ ভাবে না যে, আমি একা, আমি দুর্বল, আমি পরিচ্ছদবিহীন। (শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে)।

২০. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ / ৪ শ্রাবণ ১২৭০—মৃত্যু ১৭ মে ১৯১৩/৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) অন্যতম স্বদেশ-সংগীত। দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণের পর পুত্র দিলীপকুমার রায় আলোচ্য গান সহ ২৩০ খানি গানের 'গান' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল নিয়ে একটি 'আত্মঘাতী মতান্তর' আছে। 'আত্মঘাতী' এই কারণে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় আশ্বিন ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার ৫৪৬ পৃষ্ঠায় 'গান' শীর্ষক গ্রন্থের দিলীপকুমার লিখিত যে 'প্রথম সংস্করণের নিবেদন' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে তারিখ রয়েছে '১ আশ্বিন ১৩২৯' বঙ্গাব্দ ; অপরদিকে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই প্রকাশিত-'সাহিত্য সাধক-চরিতমালা'র ষষ্ঠ খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' (৬৯ নং) গ্রন্থে 'গান' পুস্তক সম্বন্ধে বলা হয়েছে "গান। ১ আশ্বিন ১৩২২ (২ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ১৯৯। অন্যূন ২৩০ টি গানের সমষ্টি।"

আলোচ্য স্বদেশ-সংগীতখানি 'গান' গ্রন্থের প্রথম সংগীত। মূল গান ২২ পংক্তির। 'কোরাস' পংক্তি দু'টি অন্তরার শেষে গেয়। গানটির সূচনা পংক্তি এইরকম : "বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রী আমার! আমার

দেশ।" কোরাসের পংক্তিদ্বয় হল : "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ? / সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'।"

মিশ্র ঝিঁঝিট-একতালা এই সংগীতটির কোনো শিরোনাম দ্বিজেন্দ্রলাল কখনো দেননি। ১ আশ্বিন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে পুত্র দিলীপকুমার রায়ও যখন 'গান' গ্রন্থে প্রথম সংগীত হিসাবে আলোচ্য গীতটি সংযোজিত করেন, তখনো এর কোনো নামকরণ ছিল না। কিন্তু স্যার আশুতোষের 'জাতীয় সাহিত্য' সম্পাদনাকালে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই সংগীতের শিরোনাম দিয়েছেন "আমার দেশ।" (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৪৯ ইংরাব্দ, পৃ. ৮৮।)

২১. ধোয়ী : খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর অনুকরণে রচিত 'পবনদূত' এঁর প্রসিদ্ধ কাব্য। ইনি 'কবিরাজ' আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন। "গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। / কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।" (দ্র. কবি জয়দেব ও শ্রীগীত গোবিন্দ / শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১৪)। জয়দেব এঁর সম্বন্ধে বলেছেন : "...শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি।" অর্থাৎ, ধোয়ী কবিরাজ শ্রুতিধর বলে প্রসিদ্ধ। (দ্র. শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ / প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-দামোদরঃ /) (শ্লোক সংখ্যা ৪)।

উমাপতি : উমাপতিধর। জয়দেব এঁর সম্বন্ধে বলেছেন : "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ।" অর্থাৎ, বাক্যকে পল্লবিত করাই এঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। এঁর রচনা বলে প্রচারিত 'চন্দ্রচূড়চরিত' দুষ্প্রাপ্য। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের 'দেওপাড়াপ্রশস্তি'র রচয়িতা হিসেবেও এঁর নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূক্তি গ্রন্থে উমাপতি-রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তবে 'পারিজাত হরণ' নাটকের রচয়িতা উমাপতি উপাধ্যায় স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বক্ষ্যমান উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন।

জয়দেব : (সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম ফসল) 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'-এর রচয়িতা। এই কাব্যের সমাপ্তি শ্লোকে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে : "শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য।" (দ্র. শ্রীশ্রী-গীতগোবিন্দম্ / দ্বাদশ সর্গঃ (সুপ্রীত-পীতাম্বরঃ) / শ্লোক সংখ্যা ২৯)। অর্থাৎ, পিতা ভোজদেব ও মাতা বামাদেবী। বীরভূম জেলার অজয় নদের

তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এ'র জন্ম। কেউ কেউ এ'কে মিথিলা আবার ওড়িশার অধিবাসী বলে দাবি করেন। 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'-এ লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের নাম উদ্ধৃত হলেও খোদ বঙ্গেশ্বরের নাম নেই। 'গীত গোবিন্দ'র সমাদর শুধু রসিক-সমাজেই নয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছেও এই কাব্য শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জয়দেব সম্বন্ধে বলেছেন: "না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে / পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে। / ...... মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে, / কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?" (দ্র· 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৮ সংখ্যক কবিতা)। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতীকে নিয়ে যে-সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, তার কোনো যথার্থতা পাওয়া যায় না।

শরণ: ইনিও লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের অন্যতম। জয়দেব এ'র সম্বন্ধে বলেছেন:......"শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।" দুরূহপদের দ্রুত রচনায় কবি শরণ প্রশংসনীয়।

গোবর্ধন: গোবর্ধন আচার্য। ইনিও (বঙ্গাধিপতি) লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি। আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতাধিক শৃঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকবিশিষ্ট 'আর্যাসপ্তশতী' এ'র অক্ষয় কীর্তি। এ'র রচনাচাতুর্য সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দম্'-এ বলা হয়েছে: "শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন / স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।" অর্থাৎ, শৃঙ্গাররসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় গোবর্ধন আচার্যের কেউ সমকক্ষ আছেন বলে শোনা যায় না।

২২· তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের 'পাশুপত' অস্ত্রলাভ সম্বন্ধে কাশীদাসী মহাভারত-এ আছে:

"·· কহেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর, পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন, তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জনে নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে।
যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তিশেল কোটি কোটি অস্ত্র বরিষয় ॥

প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও, অস্ত্র লহ তুমি॥"

[দ্র. বনপর্ব; 'কিরাতার্জুনের যুদ্ধ ও অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র-লাভ' পরিচ্ছেদ।]

একই বিষয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারত'-এ আছে: "অর্জুন কহিলেন, 'হে ভগবন্! যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রহ্ম শিরোনামক ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন, যে ভীমপরাক্রম অস্ত্র যুগান্ত সময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে সংহার করিয়া থাকে।......

"মহাদেব কহিলেন, 'হে পার্থ! আমি তোমাকে সেই পরমদয়িত পাশুপতাস্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে।......চরাচর মধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহ নাই।"

[দ্র. বনপর্ব; চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।]

২২(ক). ভক্তপ্রবর প্রহলাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান বিষ্ণু স্ফটিক স্তম্ভে নৃ-সিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে প্রহলাদ-জনক দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। এ-সম্পর্কে 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'-এ বলা হয়েছে:

"তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্॥
কেশব, ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥"

[দ্র. প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-দামোদরঃ); শ্লোক-৮।]

২২(খ). অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মনোনিবেশের প্রকৃষ্ট নমুনা। পাঞ্চাল দেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলী, বদাউন ও ফারুখাবাদ অঞ্চল) নৃপতি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কর্তৃক ধনুকে জ্যা পরিয়ে লক্ষ্যভেদ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এই লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত 'মহাভারত'-এর চতুরশীত্যধিকশততম হতে অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

২৩. এক বলবান্ শত বিজ্ঞানবিৎ-কে কম্পিত করতে পারে। বলের দ্বারাই পৃথিবী জেতা হয়, বলই একমাত্র স্থায়ী সম্পদ (তুমি বলেই / আত্মশক্তিতেই বিশ্বাস রাখ)।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও অনুরূপ শ্লোক পরিলক্ষিত হয়ঃ "শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে।" বিজ্ঞান যাদের আছে এমন শত লোককেও একজন বলবান্ আকম্পিত করেন। [দ্র· ৭ম অধ্যায়, ৮ম খণ্ড, শ্লোক-১।]

২৪. হারাণচন্দ্র রক্ষিতঃ চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুরে ১৮৬৪ ইঙ্গাব্দে জন্ম। পিতা হরিদাস। চার্লস ল্যাম্বের 'টেলস্ ফ্রম্ শেক্স্পীয়র'-এর অনুসরণে বাঙলা ভাষায় ৪ খণ্ডে 'শেক্স্পীয়র' প্রকাশ করেন। বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দে হারাণচন্দ্রের সম্পাদনায় মাসিক 'কর্ণধার' পত্রিকা প্রকাশ পায়। পরে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও উপেন্দ্রনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯০৩ ইঙ্গাব্দে সরকার এঁকে 'রায়-সাহেব' খেতাব অর্পণ করে। এঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলঃ বঙ্গের শেষবীর (১৮৯৭), মন্ত্রের সাধন (১৮৯৮), রানী ভবানী (১৯০৩), প্রতিভাসুন্দরী (১৯০৪) কামিনী ও কাঞ্চন (১৯০৬), ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য (১৯১১) প্রভৃতি। ১৯২৬ ইঙ্গাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

২৫. বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রকাশকাল ২ অগাস্ট ১৯০০ ইঙ্গাব্দে। অপরদিকে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'মিনার্ভা' থিয়েটারের উদ্বোধন হয় গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' দিয়ে। উদ্বোধনের দিনক্ষণঃ শনিবার, রাত্রি ন' ঘটিকা, ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ। প্রথম অভিনয়-রজনীতে গিরিশচন্দ্র হয়েছিলেন 'ম্যাকবেথ' চরিত্র। এই অভিনয়-রজনী সম্বন্ধে ৩০ জানুয়ারির 'ইংলিশম্যান', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। খ্যাতনামা নট অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন।" (দ্র· রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর / স্বপন মজুমদার সম্পাদিত; ৬ নভেম্বর ১৯৯১ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ· ৭০)। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যও মন্তব্য করেছেনঃ "ঊনবিংশ শতকে 'ম্যাকবেথ' নাটকের যতগুলি বঙ্গানুবাদ বা ছায়ানুবাদ হয়েছিল তাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটকটি সবচেয়ে ভালো।" (দ্র· গিরিশ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, জুন ১৯৭৪ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ· ত্রিশ—তেত্রিশ)।

২৬. সকলের মনোরঞ্জন হয়—এমন বাক্য অত্যন্ত দুর্লভ। (দ্র· ভারবি রচিত মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্', চতুর্দশ সর্গ, শ্লোক পঞ্চম। মহাভারতে

বর্ণিত শিবের নিকট হতে অর্জুনের 'পাশুপত' অস্ত্রলাভ কাহিনী এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু)।

২৭. জ্ঞাতসারে অশোভন কিছু করিনি ; লোকে কি বলবে তা লোকই জানে। (দ্র. শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধচরিতম্' নবম সর্গ, শ্লোক ১২৩। ২২টি সর্গে এই কাব্য রচিত। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানই এই কাব্যের উপজীব্য। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে এই কাব্য লিখিত হয়)।

২৮. রামপ্রসাদ : কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটি থানার অধীন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে অবস্থিত হালিশহর গ্রামে জন্ম। এই গ্রামের পূর্বনাম কুমারহট্ট। পিতা রামরাম সেন, মাতা সিদ্ধেশ্বরী। রামপ্রসাদের জন্মসাল ও মৃত্যুকাল নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। (দ্র. ৪ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী)। তবে যত বছর জীবিত ছিলেন কালী-সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। এঁর রচিত সঙ্গীত 'আজ বাংলার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত, ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত।' আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "শাক্ত গীতি-হারের মধ্যমণি হইতেছে প্রসাদ-পদাবলী।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের ভগবদ্ভক্তি ও কবিত্বে মুগ্ধ হয়েই তাঁকে একশ' বিঘে নিষ্কর জমি দান করেন। প্রতিদানে 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নামে একখানি কাব্য রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। প্রসঙ্গত, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের স্রষ্টা সংস্কৃত-কবি বররুচি)। (দ্র. সাধক রামপ্রসাদ / স্বামী বামদেবানন্দ ; মে ১৯৮৬ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ)।

ভারতচন্দ্র : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ১৭১২ ইঙ্গাব্দে (১১১৯ বঙ্গাব্দে) আধুনিক হাওড়া জেলার সীমান্তে ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো গ্রামে জন্ম। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ফার্সী ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সবিশেষ অধিকার অর্জন করেছিলেন ভারতচন্দ্র। আনুমানিক চল্লিশ বছর বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান এবং মূলাজোড়ে বসতি স্থাপন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই রচনা করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তির নিদর্শন 'অন্নদামঙ্গল'। 'বিদ্যাসুন্দর' নামেও একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন, তবে তা রসোত্তীর্ণ নয়। মূলতঃ, 'অন্নদামঙ্গল'-এর জন্যই ভারতচন্দ্রকে 'বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি' আখ্যা দেওয়া হয়। কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৬০ ইঙ্গাব্দে (১১৬৭ বঙ্গাব্দে) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি কবির জীবনাবসান হয়।

২৯. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬০ সংখ্যক শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়, অজ্ঞানবশত যা তুমি করতে চাও না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা করবে।

৩০. হে পার্থ, যে-ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে। (দ্র· শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক—১৬)।

৩১. কঠোপনিষৎ-এর শ্লোক (১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী, শ্লোক—১৪)। মূল শ্লোকটি এই রকম : "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। / ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" স্বামী বিবেকানন্দ আলোচ্য শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন এইরূপ :

"—Arise! awake! and stop not till the goal is reached.

"—(ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না)।"

[দ্র· স্বামি-শিষ্য সংবাদ, পৃ· ৯৮ ; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ।] অথচ গ্রন্থে উল্লিখিত পংক্তিটির আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া উচিত : "ওঠ, জাগো, প্রাপ্য বর মাগিয়া লও।' চিত্রিতা দেবী পুরো শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন এইভাবে : "ওঠো হে মানব, / তমোঘোর হতে জাগো। / মহামানবের পাশে গিয়ে / জানো তত্ত্ব। / কঠিন সে পথ, দুর্গম অতি, / ক্ষুরের ধারের মত, / তবু সেই পথই সত্য / এই তো কবির বাণী॥"

৩২. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা' নামক কবিতা হতে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্য ২ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী।

কৃত্তিবাস

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?"

—মাইকেল মধুসূদন।[১]

ব্যাস, বাল্মীকি[২] ও কৃত্তিবাস—সামান্য প্রণিধান-সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধি হয় যে, যে সকল সংস্কৃত কাব্য কোনও ঋষি কর্ত্তৃক বিরচিত নহে, তাহাদের অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব পরিস্ফুট ; কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ-বা রত্নাকরের নানা-রত্ন-সমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী ; ব্যাস বা বাল্মীকির কাব্যের আদর্শ যেমন পরবর্ত্তী অনার্য্য কবির কাব্যের উপজীব্য,—তদ্রূপ বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব—তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্ রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কৃত্তিবাসের কবিতারূপ কল্পনা-কানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাস-বাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেরই পুনরায় বর্ণনা করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবন্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও[৩] শ্লোকবন্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের[৪] বহু পূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিদ্বদ্বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি ? একান্ত সুপরিচিত ও সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পদ-শালিনী না হইত, তাহা হইলে কেবল ভাবের তরঙ্গ-লীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা-বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবু যে কালিদাস এত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান

কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জনসমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র কারণ ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য গঠিত, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সর্ব্ববাদি-সম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। সেরূপ ভাষায় নিবন্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়; অল্প-কাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা-ধমনী-কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন,—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলে সমান ভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস সর্ব্বতোগামিনী, সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ে সকল সময়ে সকলের প্রিয়, মহা-কবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনবদ্য রামায়ণকাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী, সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই সকল কাব্যের প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না! ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস,—এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণ-রচয়িতা—কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনা-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট

করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসংকোচে বলা কঠিন।

এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবন্ধ করেন।[৫] তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি[৬] রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। কালে হয়ত আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্[৭] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[৮] মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য সাহিত্যপরিষদ্ এবং দীনেশবাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে—সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে—কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে—চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজে রাম-সীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থ-রচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে বা মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসের ন্যায় মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থ কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনার দৈন্যে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের[৯] নাম উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্র তাঁহার রচিত রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বার[১০] নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু

সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশসমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন,—যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জনসমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত,—তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দু'একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায়-রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান কতটুকু বা কতটা তাহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন-রঞ্জন হইবে। কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শ তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজন মত অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুত-রামায়ণ[১১] প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সংকলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য ততই অল্পকাল-স্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ-গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায় এই প্রকার কোন বিশেষ ভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়ের মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ-রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর[১২] "রামরসায়নে"র অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে

প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কোথাও দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অংকন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণ অপরাপর রামায়ণ অপেক্ষা ভাবুক-সমাজের, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেরই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি[১৩]যেমন তাঁহার উত্তর রামচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য-সহকারে রঙ্ ফলাইয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন—যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে – কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, সেই সেই চিত্র বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন,—অলংকারের গুরুভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব[১৪] আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন, কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের বান ডাকিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণসমূহে

তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র সাহিত্যকে 'তদ্ভাব-ভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর, কি করুণ, সকল-রসেই নদীয়ায় ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণবসেবকগণের ন্যায় করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গিনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই-একটি স্থল ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্ত-লিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারি-গণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়,[১৫] তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে,—

"পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি ॥"

সেই স্থানে পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে[১৬] আছে—

"রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥"

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন। কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া

সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্য নিহিত আছে। আমাদের দেশে যখন যে কোনও নতুন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নানাবিধ নব নব ভঙ্গিরাগবিভূষিত, শ্রুতিমধুর বঙ্গ-ভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনই আমরা আমাদের প্রাচীন দুর্ব্বোধ শব্দ-সঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম; তাই আমরা প্রাচীন

"আমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"[১৭]

ইহার স্থলে

"অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল হলো"

করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্ধ-সংস্কৃত, অর্ধ-হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের

"মুঞি" "ভিলন্ত" "কর্‌যা" "থুয়্যা" "পাকল"

প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য কাল তাহা গ্রহণ করিবে; যাহা বর্জনীয়, কাল তাহা বর্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্ত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণব প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পুরিয়া দিয়া স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা—তাহার গন্তব্য পথ—রামায়ণী কথার আশ্রয়ে

কালিদাস ও ভবভূতি, রঘুবংশ ও উত্তরচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান। সেই সতত-চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিকৃত পথ কল্পনার দৌত্যে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন[১৮] প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি-সংকেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলি-সংকেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও-বা নূতন পথে, যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়—আনুমানিক ১৩০৬ শক—১৩৮৫[১৯] খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগদেবতা নঃ"[২০] বলিয়া যে দিন ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর[২১] কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ[২২] হইতে সপ্তদশপুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ[২৩] রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ

সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের[২৪] রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সংকল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশপরিচয়ের উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয় "ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিতা ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥"[২৫]

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরম দয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা,[২৬] কৃত্তিবাসের পিতামহ, এক জন প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস-মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে তিনি প্রধানতঃ চতুষ্পাঠিতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠির শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণপাঠের সোপান। পাঠ-সমাপ্তির পর, সেই কালের প্রথা-অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ[২৭] উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন:

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে তথা কৃত্তিবাস গুণী॥"—[২৮]

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি-সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব। এখনও "ফুলিয়ার মুখটি"[২৯] বলিয়া

আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি" কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগরঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণ-কিরীট পরাইয়া দিয়াছিল—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জনপদ-বধূর গোষ্ঠী-বন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময় হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্নে মলিনবসনা বিধবারা সমবেত হইয়া কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ্ রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পাদপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্য-কুটিরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যার গঙ্গা তরঙ্গিণী" —[৩০]

সে "ফুলিয়া" নাই, সে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই; কিন্তু সেই ফুলিয়া-পণ্ডিতের মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া—বিভোর করিয়া—রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতকগুলি কারণও দেখা যায়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী[৩১] প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে—প্রাণ দিয়া পূজা

করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত বা অনুভূতির বিমল-কর-ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণ ভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণ ভাবে আপনার প্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না; সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কবিতার কোথায়ও কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না, সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মহাকবি তাঁহার সাধের রামায়ণগান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছে, যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন তত দিন করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট্ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট্ হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। অন্যথা তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না—তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপক রাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে,[৩২] তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত

হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার, বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ—একেবারে আকুল—করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে"—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কলা-বিদ্যা-বিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না—তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে তোমার দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায়[৩৩] অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য রামায়ণ অবলম্বনপূর্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বর-বিলাস করিয়াছেন, অমনই সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক অকস্মাৎ তাঁহার কর্মময় দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত, আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ"[৩৪] বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয়

নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও ভারত-বাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে ; সেইরূপ, কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে, পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুলকুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন—আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগিরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও—তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রাম-সীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা যেমন চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে তেমনই ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটি, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরবের স্থল, পরম স্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমর করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণ মন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন ; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতেরই "তান" প্রদান করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে তাঁহার স্বজাতির জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র,[৩৫] আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন—এ জন্য আপনারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কৃত্তিবাস যে সমুন্নত বংশের অলংকার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটির একজন কবিতা-রসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি

উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস। এই দেখ তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত। তুমি তাহাদিগের সারস্বত ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবান্বিত—কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি. আবার আসিয়া

"পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী,
তেমতি, যশস্বী, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"[৩৬]

উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১. মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক ৩ সংখ্যক কবিতা হতে গৃহীত ; যার প্রারম্ভিক কয়েকটি পংক্তি : "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;— / তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি, / পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ / পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।" এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৮৬৬ ইস্রাব্দ।

২. ব্যাস : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র। পিতা ঋষি পরাশর, মাতা দাসরাজার পালিতা কন্যা সত্যবতী। বেদবিভাগ-কর্তা বলে নাম বেদব্যাস ; যমুনাদ্বীপে জন্ম ও গাত্রবর্ণের কৃষ্ণতা হেতু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলে সুবিদিত। বেদব্যাসের ঔরসেই বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। (দ্র. মহাভারত / কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত ; আদিপর্ব, অধ্যায়-১০৫-১০৬)। মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা।

বাল্মীকি : 'আদি কবি' নামে খ্যাত। প্রচেতা ঋষির বংশধর। তমসা নদীর তীরে এঁর আশ্রম ছিল। [যৌবনে রত্নাকর নামে দুরাচারী দস্যু

ছিলেন।] রামায়ণ মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। / যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" (রামায়ণ—১।১।৯৮); সেই রামচরিত মহর্ষি বাল্মীকি ২৪ হাজার শ্লোক, ৫ শত সর্গ এবং উত্তর কাণ্ড সহ সপ্ত কাণ্ডে বর্ণনা করেছেন; যার নাম 'রামায়ণ'। "চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকা নামুক্তবানৃষিঃ। / তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥" (রামায়ণ—১।৪।২)। এই মহাকাব্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছেঃ "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। / তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচারিষ্যতি।" (রামায়ণ—১।২।৩৬)। যতকাল পর্বত ও নদীসমূহ পৃথিবীতে অবস্থান করবে, ততকাল রামায়ণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত থাকবে। সুকুমার সেনের মতে, রামায়ণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।

৩. মহাকবি কালিদাসের পরিণত প্রতিভার অন্যতম সাক্ষী 'রঘুবংশ'। এই কাব্যের উপজীব্য সাধারণভাবে সূর্যবংশীয় নরপতিদের বর্ণনা, বিশেষে রামের জীবন বৃত্তান্ত। উনবিংশ সর্গে সমাপ্ত। এর রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিত-গবেষকগণ অদ্যাপি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তবে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখিত হয়েছিল প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৫-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

৪. কালিদাসের আবির্ভাব কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোর বিবাদ আছে। একপক্ষ তাঁকে (কালিদাসকে) খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের মানুষ বলেছেন, অপরপক্ষ তাঁকে টেনে এনেছেন খ্রীষ্টীয় শতকে। কালিদাসের জীবদ্দশার সন-তারিখ নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা যতই থাক, জনপ্রিয় মতবাদ হল: কালিদাস একাধিক গুপ্তরাজার আমলে বর্তমান ছিলেন। গুপ্ত যুগ মোটামুটিভাবে ৩০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি এই জনশ্রুতিকে মর্যাদা দেওয়া হয় যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন, তাহলে দেখা যাবে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৫৭-৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ) অথবা প্রথম কুমারগুপ্তের (৪১৩-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে বর্তমান ছিলেন। কারণ এঁরা উভয়ই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এ-ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: (ক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস / ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৮৬-৮৮; এবং (খ) সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ২য় খণ্ড, ২৮ এপ্রিল ১৯৮০ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৬-৭।

৫. বাঙলা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ যে কৃত্তিবাস ওঝা-ই প্রথম করেছিলেন—এমন স্থির সিদ্ধান্ত করা বাস্তবিক দুরূহ কাজ। কারণ—প্রথমত, কৃত্তিবাসের জন্ম-সাল নিরূপণ আজো সুনিশ্চিতভাবে হয়নি; দ্বিতীয়ত, বাল্মীকি, সক্রেটিস, হোমার প্রমুখের মতো কৃত্তিবাসের কোন হাতে লেখার চিহ্ন পৃথিবীতে নেই। এমনকি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৫ খণ্ডে ১৮০৩ (মতান্তরে ১৮০২) ইঙ্গাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে যে প্রকাশিত হয়েছিল, তা-ও প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড সংগৃহীত পুঁথিকে ভিত্তি করে। সুকুমার সেনের মতে, এই সব পুঁথির লিপিকাল ১৫০-২০০ বছরের বেশি নয়। (দ্র. ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৩৮২-৮৩)।

৬. দীনেশচন্দ্র সেন কৃত্তিবাস ব্যতীত যে-চতুর্দশ রামায়ণ রচয়িতার উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন: দ্বিজ মধুকণ্ঠ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাধর সেন, ভবানীদাস (এঁর গ্রন্থেরনাম 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়'), দ্বিজ দুর্গারাম (শোনা যায়, কৃত্তিবাসের পরেই ইনি রামায়ণরচনা করেছিলেন), জগৎরাম রায় (এঁর অনূদিত রামায়ণের শেষ দুটি পালা পুত্র রামপ্রসাদের রচনা), শিবচন্দ্র সেন (এঁর গ্রন্থের নাম 'সারদা মঙ্গল'; শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারা মাহাত্ম্য জ্ঞাপক, তাই কাব্যের নাম এই প্রকার), নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য (ইনি সীতাকে কালীর অবতার বলে কল্পনা করেছেন), শঙ্কর কবিচন্দ্র, শঙ্কর (আদি, অরণ্য, অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দর—এই পাঁচটি কাণ্ডের অনুবাদক), লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন গোস্বামী (এঁর গ্রন্থের নাম 'রামরসায়ন'), বুদ্ধদেব (এঁর গ্রন্থ 'রামলীলা'), রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। (দ্র. বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য / ২য় খণ্ড / প. ব. রাজ্যপুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত / পৃ. ৫০৮-৫১৭)।

৭. ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সর্ববিধ উন্নতি সাধনই ছিল পরিষদ-প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসেবেই পরিষদের তরফে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মধ্য হতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা উদ্ধার করার চেষ্টা চলে। সেই গবেষণার ফসল হিসেবেই পরিষদ ১৩০৭ ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের যথাক্রমে অযোধ্যা কাণ্ড ও উত্তর কাণ্ডের সংস্করণ প্রকাশ করে। স্যার আশুতোষ সম্ভবত পরিষদের এই ভূমিকার কথা স্মরণ করেই অভিভাষণে পরিষদের প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের

প্রয়াস করেছিলেন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় আদিকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, ভট্টশালী মহাশয় সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদনা সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং উত্তরকাণ্ডের কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। (দ্র. সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৬৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, পৃ. ২৫৩)।

৮. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্র সেন (জ. ৬ নভেম্বর ১৮৬৬—মৃ. ২০ নভেম্বর ১৯৩৯)-এর অক্ষয়কীর্তি। এই গ্রন্থের জন্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ ইঙ্গাব্দ। এছাড়াও দীনেশচন্দ্র ৩৯ খানি মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদনা করেছেন ময়মনসিংহ গীতিকা, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সহ ১২ খানি গ্রন্থ। ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যাও বারো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শংসাপত্র উচ্চস্তরের না হলেও (দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৮ম খণ্ড, ৯০ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃ. ৮) স্যার আশুতোষের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ১৯৩৬ ইঙ্গাব্দে প্রকাশিত ২৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'আশুতোষ স্মৃতিকথা' দীনেশচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উজ্জ্বল নিদর্শন।

৯. প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবর্তী। 'দ্বিজ কবিচন্দ্র' হিসাবে খ্যাত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্ম। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি ছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত কাহিনীর অবতারণা করে কবিচন্দ্র বঙ্গভাষায় একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেছিলেন, যা দক্ষিণ রাঢ়ে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' তথা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' নামে খ্যাত। শিব ও রামের মধ্যে যুদ্ধ এই রামায়ণের বৈশিষ্ট্য। রামায়ণ ব্যতিরেকেও কবিচন্দ্র 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিবায়ন'-ও কবিচন্দ্রের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন (দ্র. বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৮-২১৯)।

১০. কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অন্যতম অংশ হিসেবে আজো প্রচলিত। অনেকেই 'অঙ্গদের রায়বার' অধ্যায়টিকে বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অংশ হিসেবে অভিমত দিয়েছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে : লঙ্কায় সেনা-সন্নিবেশের পর রামচন্দ্র অঙ্গদকে রাবণ-সমীপে দূতরূপে পাঠিয়েছেন। "দূতোহহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। / বালিপুত্রোহঙ্গদো নাম যদি তে শোত্রমাগতঃ ॥" (৬।৪১।৭৭)। কিন্তু রাবণের সভায় আসন না

পেয়ে অঙ্গদের লেজের কুশন বানিয়ে উপবেশন এবং রাবণের মুকুট ছিনিয়ে আনার কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই। "বসেছে রাবণরাজ উচ্চ সিংহাসনে।/ তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে॥ / কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে। / পুরন্দর যার যেন দিল ঐরাবতে॥" ... ..."রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন। / মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন ॥ /......রাবণ বলিছে সবে আছ কোন কাজে। / বানরে মুকুট লয় সভাকার মাঝে॥ / ......মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য বদন। / তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥"

১১. কালিকাপুরাণ: বঙ্গদেশ এবং কামরূপে অবস্থিত স্মার্তগণের কাছে এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রধানত এই মতেই হয়। এই পুরাণের মধ্যে নন্দিকেশ্বর, বৃহদ্ধর্ম, শাম্ব এবং সৌর পুরাণের সমাবেশ ঘটেছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ: প্রচলিতভাবে দ্বিজ কবিচন্দ্র-বিরচিত রামায়ণই 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হিসেবে খ্যাত (দ্র. ৯ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী।) কিন্তু চতুর্দশ / পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে অনুমিত একটি 'অধ্যাত্ম রামায়ণে'রও সন্ধান মিলেছে। ব্রহ্মান্ড পুরাণের অন্তর্গত বলে কথিত শিব-পার্বতীর কথোপকথন আকারে এই রামায়ণ রচিত। এটি সপ্তকান্ডাত্মক। গ্রন্থের 'রামহৃদয়' ও 'রামগীতা' অংশ দুটি রামভক্তগণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

অদ্ভুত রামায়ণ: সাধারণভাবে ষোড়শ শতকের শেষভাগে পাবনা জেলায় (অধুনা বাংলাদেশের) জাত নিত্যানন্দ আচার্যের রামায়ণই 'অদ্ভুত রামায়ণ' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অবিভক্ত বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর দিকে এই রামায়ণের প্রভূত জনপ্রিয়তা ছিল। ইনি 'অদ্ভুত আচার্য' ভনিতায় পদ রচনা করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন একই ভনিতার আরেক রামায়ণ লেখকের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর নাম রামশঙ্কর দত্ত। "এঁর জীবৎকাল নির্ণয় করা যায় নাই।... রামশঙ্কর 'কৃত্তিবাস' এর ও নিত্যানন্দের রামায়ণ মিলাইয়া সংক্ষেপে রামকথা লিখিয়াছিলেন।" (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড অপরার্ধ, ৩য় সংস্করণ ১৯৭৫, পৃ. ১৩৩)।

বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের অর্বাচীন পরিশিষ্টকেও 'অদ্ভুত রামায়ণ' বলা হয়। এর অন্য নামও আছে—'অদ্ভুতোত্তর কান্ড'। ভরদ্বাজ মুনি-সমীপে বাল্মীকি-কর্তৃক কথিত অংশই আলোচ্য কান্ডের বিষয়। ২৭ টি অধ্যায় এবং ১৩৫৯ টি শ্লোকে এই কান্ড সম্পূর্ণ। রামায়ণের এই অংশে সীতাকে

রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর কন্যারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই কাণ্ড কাশ্মীরের শাক্ত সমাজে আদৃত।

১২. পুরো নাম রঘুনন্দন দাস গোস্বামী। ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দশম অধস্তন পুরুষ। ১৭৮৬ ইংগাব্দে বর্ধমান জেলার মাড়ু গ্রামে জন্ম। বঙ্গভাষায় 'রামরসায়ন' তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য। সংস্কৃততে 'গৌরাঙ্গচম্পূ'র রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা ৩২টি বিলাসে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৩. কালিদাসোত্তর যুগের খ্যাতিমান নাট্যকার। পিতা নীলকণ্ঠ, মাতা জাতূকর্ণী। পারিবারিক উপাধি 'উদুম্বর'। 'রাজতরঙ্গিনী'র স্রষ্টা কহ্লণ ভবভূতিকে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মনের সভাকবি বলেছেন। দশ অংকে রচিত ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকের পুষ্পিকায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টীকাকারগণ অভিমত দিয়েছেন যে, ভবভূতি উপাধি মাত্র; আসল নাম মণ্ডন মিশ্র; সুরেশ্বর, বিশ্বরূপ নামেও অভিহিত হতেন। অথচ আমরা দেখতে পাই, ভবভূতি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি লাভ করেছিলেন। সাত অংকে রচিত তাঁর 'উত্তররামচরিত' শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে পরিগণিত হয়। 'মহাবীরচরিত'ও তাঁর অন্যতম নাট্যগ্রন্থ। ভবভূতি খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষ ভাগে অথবা ৮ম শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

১৪. চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ ইঙ্গাব্দ) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়। (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ১৯৭৮ সংস্করণ, পৃ. ২৮৪)। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে এই তারিখ '১৪৮৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি'। (দ্র. চৈতন্য প্রসঙ্গ, রথযাত্রা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৩১)। রমেশচন্দ্র মজুমদার পূর্বোক্ত সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি অভিমত দিয়েছেন। (দ্র. বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, আশ্বিন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৬৩)।

১৫. শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে ৫ খণ্ডে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হয়। মূল্য ছিল ২৪ টাকা। প্রত্যেক খণ্ডের নামপত্রে প্রকাশকাল দু'রকম : ইংরেজি নামপত্রে ১৮০২ এবং বাংলায় ১৮০৩। (ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা আরও অনেক গ্রন্থে এইভাবে দুই রকম তারিখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা 'ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ'এর একটি সংস্করণের নামপত্রে তারিখ আছে বাঙ্গালা হরফে ১৮৩২ এবং ইংরেজী

হরফে ১৮৩৩।" দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ১২৫, টীকা—৩)। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩-৩৪ ইঙ্গাব্দে। দু'খণ্ডের এই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

১৬. বটতলায় প্রথমে এবং অনেকদিন ধরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাণ্ডগুলি আলাদা আলাদাভাবে ছাপা হত। যেমন—আদিপর্ব ১৮৩১ ইঙ্গাব্দে রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ছাপা হয়। মূল্য ছিল তিন টাকা। ১৮৬০ ইঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে সমগ্র রামায়ণ বটতলা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রথম সংস্করণের পাঠ প্রামাণ্য এবং ভালো পুঁথি থেকে নেওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের বটতলা প্রকাশকেরা সে-সংস্করণ ব্যবহার করেন নি। (দ্র. বটতলার ছাপা ও ছবি / সুকুমার সেন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সংস্করণ, পৃ. ৩৬, ৫২; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ১২৫)।

১৭. সর্বজনীন বিশ্বাস যে, পদটি চণ্ডীদাসের। কিন্তু 'চণ্ডীদাস' ভনিতায় যে-সকল পদের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলি অকৃত্রিম নয় বলেই গবেষকদের অভিমত।

১৮. রামকথায় 'তরণীসেন' ও 'বীরবাহু' চরিত্র কৃত্তিবাসের নিজস্ব সংযোজন। তরণীসেন বিভীষণ-সরমার এবং বীরবাহু রাবণ-চিত্রাঙ্গদার পুত্র। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সহায়ক হিসেবে এঁরা শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। উভয় চরিত্রই অবহিত যে, শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যমাত্র নন—বিষ্ণুর অংশ। তাঁর হাতে মৃত্যু মানেই বৈকুণ্ঠবাসের অনুমতি লাভ। বীরবাহু যুদ্ধযাত্রাকালে জননী চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন: "সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন। / রথে চড়ে যাব আমি বৈকুণ্ঠ ভুবন।।" তরণীসেনের যুদ্ধযাত্রায় সরমা পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন: "তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি। / শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোলোকের পতি।।" উত্তরে তরণীসেন বলেছেন: "বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি।। / তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্যাস। / মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস।।"

কৃত্তিবাসের এই সৃষ্টি এত জীবন্ত হয়েছিল যে, প্রায় তিন শতাধিক বর্ষ পরে দাশরথি রায় সেই সূত্রে লিখলেন পাঁচালী-পালা 'তরণীসেন-বধ'। (দ্র. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দশরথি রায়ের পাঁচালী / ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ৪৩৬-৪৪৪)। এবং কিঞ্চিদধিক পৌনে চারশো বছর

প'র মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৩১ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ড, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৮৬১ ; এবং ১০৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশকাল : ১৮৬১ ইঙ্গাব্দ)। সেই কাব্যের সূচনা হল বীরবাহুর মৃত্যুশোকের দৃশ্যপট দিয়ে। (দ্র. মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ, ১-৪১০ পংক্তি)।

১৯. কৃত্তিবাসের জন্ম সাল-নির্ণয় বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীদাস-সমস্যার সঙ্গে তুলনীয়। ডঃ সুকুমার সেন যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ-গণনা করতে না পারলেও দৃঢ়তার সঙ্গে অভিমত দিয়েছেন যে, 'কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। অর্থাৎ, ১৪৭৫-১৫০০ ইঙ্গাব্দ সময়ের মধ্যে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন। (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ১৯৭৮ ইঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১১৩-১২২)। যাঁরা কুলশাস্ত্র ভরসা করে কৃত্তিবাসের জন্মসাল-নির্ণয় করেছেন, তাঁদের গবেষণা সম্বন্ধে ডঃ সেনের মন্তব্য : "সত্যের সঙ্গে মিথ্যা অনির্বিচারে মিশাইলে তাহা মিথ্যার অপেক্ষাও তুচ্ছ। ঘটকের পাঁজিকে ইতিহাসের কাজে লাগানো মানে মিথ্যার অপেক্ষা-তুচ্ছ যে অ-সাধ্য তাহার দ্বারা আর একটি সাধ্যকে সিদ্ধ প্রতিপন্ন করা। ইহা ন্যায়ের বিচারে বেদের নজির দেওয়ার মতোই বিচারমূঢ়তা।" (দ্র. তদেব, পৃ. ১২১)। তবে পরবর্তীকালে তপেন্দ্রনারায়ণ দাশ তাঁর 'কবি কৃত্তিবাস ও গৌড়েশ্বর' নিবন্ধে কৃত্তিবাসের জন্মসাল সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক-সমাধান দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। (দ্র. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০-১০৯)।

২০ 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' উল্লেখপঞ্জীর ১৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২১. গৌড়ের রাজা আদিশূর। কর্ণসুবর্ণ তখন গৌড়ের রাজধানী। প্রবাদ আছে, এই নৃপতি বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ (বর্তমান নাম কনৌজ, উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায় অবস্থিত) হতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে আনিয়েছিলেন। কারণ গৌড়-বাংলায় সে-সময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। আদিশূরের অনুরোধে কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ যে-পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন : ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ।

২২. কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ শ্রীহর্ষ এবং গৌড়রাজ বিজয় সেনের উদ্দেশে

রচিত 'বিজয়প্রশস্তি' ও 'গৌড়োর্বীশকুল-প্রশস্তি' রচয়িতা শ্রীহর্ষ এক ব্যক্তি কিনা—সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

২৩. ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'বেদানুজ' নামটির কোন অর্থ হয় না এবং এই নামের পাঠান্তর নেই। (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ. ১১৯)।

২৪. কৃত্তিবাসের তথাকথিত আত্মবিবরণীতে আছে : "পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।" স্যার আশুতোষ শুধু বেদানুজকে 'পূর্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা' কীভাবে বললেন, তার উৎস-নির্দেশ করেন নি। তাছাড়া, কৃত্তিবাসের নামে যে-আত্মবিবরণী চালু আছে, তা যে প্রাচীনও নয় এবং অকৃত্রিমও নয়, সে-সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন পূর্বোক্ত গ্রন্থে। (পৃ. ১১৪-১২৪)। এদিকে, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী হিসেবে 'সুবর্ণগ্রাম' নামে একটি স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। (দ্র. পৌরাণিকা/ অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৯৮৮ সংস্করণ, পৃ. ৭৪৯)।

২৫. পংক্তিদ্বয় কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত আত্মবিবরণী হতে গৃহীত। এর পাঠান্তরও আছে। যথা—'ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি। / ধন ধান্য পুত্র পৌত্র বাড়য় সন্ততি।।' (দ্র. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর ভূমিকা, পৃ. কুড়ি)।

২৬. কৃত্তিবাস পিতামহ মুরারি ওঝাকে ব্যাসদেব—মার্কণ্ডেয় প্রমুখের মতো স্বনামধন্য পণ্ডিত আখ্যা দিয়েছেন ('মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি। / ধর্মচর্যায় রত মহান্ত যে মানী।। / মদরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি। / মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি।।') অথচ অদ্যাবধি তাঁর পাণ্ডিত্য কীর্তি আবিষ্কৃত হল না—এই তত্ত্ব যুক্তির নিরিখে বিচার করা চলে না।

২৭. কৃত্তিবাসের তথাকথিত আত্মবিবরণীতে আছে :

"রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।।
দ্বারি হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম।।
সপ্তঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই আইল দূত হাতে সুবর্ণ লাঠি।।

কার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ।।
নয় দেউড়ী পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহসম বসি রাজা সিংহাসন পরে ।।
* * * *
রাজার ঠাঁঞি দাণ্ডাইলাম চারি হাত আন্তর।
সাতশ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ।।"

(দ্র. মাধুকরী / কবিশেখর কালিদাস রায় সম্পাদিত, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, ভূমিকা—পৃ. ৫ এবং মূলগ্রন্থের পৃ. ২)।

২৮. তদেব, পৃ. ৩।

২৯. বঙ্গের কুলীন মুখোপাধ্যায় বংশ শান্তিপুর ফুলিয়া গ্রাম হতে উদ্ভূত। এ-কারণে এই বংশীয়রা 'ফুলিয়া মুখটি' নামে পরিচিত। এই মত পোষণ করেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, ১৯৪৯ সংস্করণ, পৃ. ৮৯)। কিন্তু অন্য একটি সূত্রে প্রকাশ যে, আচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান—এই ন'টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণের মূল 'উপাধ্যায়' উপাধির প্রথমে 'মুখ' নামের যিনি যে-গ্রামে বাস করতেন, সেই গ্রামের নাম যুক্ত হয়ে তিনি 'মুখোপাধ্যায়' উপাধিতে পরিচিত হন। বাঁকুড়া জেলার অম্বিকা পরগনায় মুকুটী গ্রাম-নাম হতে মুখোপাধ্যায়ের উৎপত্তি। আবার, মনু সংহিতা মতে, যিনি জীবিকার জন্য বেদের একাংশ মাত্র কিংবা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তাঁকে 'উপাধ্যায়' বলা হয়। এবং সংস্কৃত 'উপাধ্যায়' বিহারে ও বঙ্গদেশে 'ওঝা' হয়ে দাঁড়ায়। 'মুখটি'র সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে মুখুওঝা এবং ক্রমে দেশজ উচ্চারণের ফলে তা 'মুখুজ্যে' বা 'মুখোপাধ্যায়' হয়ে দাঁড়ায়। (দ্র. পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস / খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, ঙ-বিভাগ, পৃ. ৪২ ও ৫৫)।

৩০. কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী হতে গৃহীত।

৩১. রামচন্দ্র : রামায়ণের প্রধান পুরুষ। পিতা দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ-সমাপ্তির দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথি ও পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগে সৌর বৈশাখ মাসে কৌশল্যার কোলে রামের আবির্ভাব। হিন্দুরা রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতমরূপে পুজো করেন। উত্তররামচরিত-এ ভবভূতি রাম-চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন : "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥'' (২/৭)। মহর্ষি বাল্মীকি অবশ্য রাম চরিত্র বর্ণনার মধ্যে এটাই দেখাতে চেয়েছেন, মানুষের আদর্শ কতটুকু উঁচুতে উঠতে পারে।

যুধিষ্ঠির : মহাভারতে 'পান্ডু' চরিত্রের প্রথম পুত্র। পান্ডুর নির্দেশে মাতা কুন্তী ধর্মের ঔরসে গর্ভধারণ করেন। সেইভাবেই শতশৃঙ্গ পাহাড়ে জ্যৈষ্ঠ পঞ্চমী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে কুন্তীর কোলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। জন্মের সময়েই দৈববাণী হয়েছিল যে, শিশু ধার্মিক ও পৃথিবী-পতি হবে। ভবিতব্যতায় দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যে-ছেলে জন্মায়, তাঁর নাম প্রতিবিন্ধ্য। যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজা শিবির কন্যা দেবিকা। এঁদের সন্তান যৌধেয়।

কর্ণ : সূর্যের ঔরসে কুন্তীর কানীন পুত্র। পালক পিতা ও মাতা যথাক্রমে চম্পাপুরীর রাজা সূত অধিরথ ও রাধা। বসু অর্থাৎ সুবর্ণ নির্মিত কবচ-কুন্ডল ধারণ করে জন্ম বলে অপর নাম বসুষেণ। স্ত্রী পদ্মাবতী, পুত্র কৃষ্ণসেন, চিত্রসেন, বৃষকেতু, সত্যসেন ও সুষেণ। দুর্যোধনের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা; জতুগৃহের মন্ত্রণাদাতাদেরও অন্যতম। শত প্রলোভনেও দুর্যোধনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হননি।

ভীষ্ম : কুরুবংশে শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার অষ্টম পুত্র। গঙ্গা নাম রাখেন দেবব্রত। বশিষ্ঠের কাছে শাস্ত্র এবং পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা পান। পিতা শান্তনুর দ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েও বিমাতা সত্যবতীকে ঘরে আনতে দাসরাজের দাবি অনুসারে সিংহাসনলাভের স্পৃহা হতে চিরকালের মতো সরে আসেন এবং চিরকৌমার্য ব্রত নেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে প্রথম সেনাপতি। আটান্ন দিন শরশয্যায় কাটিয়ে মাঘ মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে ইচ্ছামৃত্যু নেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের এক অপূর্ব সৃষ্টি এই ভীষ্ম চরিত্র।

দধীচি : বশিষ্ঠ-পুত্র অথর্বা মুনির ঔরসে কর্দম কন্যা শান্তির গর্ভে জন্ম। মহাভারতে ইনি ভৃগুর পুত্র। ভাগবতে এঁর নাম দধ্যঙ্। মায়ের নাম চিত্তি। কঠোর তপস্বী। এঁর অস্থি দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র, চক্র, গদা ও দন্ড তৈরি করেন এবং অসুর-বিনাশে তা প্রয়োগ করেন।

শিবি : সংহ্লাদের মধ্যম পুত্র। মহাভারতে ইনি দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুর ছেলে। অপর মতে, ইনি প্রহ্লাদের ভাই অনুহ্লাদের পুত্র। উশীনর

বংশে শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ নিয়েছিলেন এবং দ্রোণের হাতে এঁর মৃত্যু হয়। একাধিক কাহিনীতে শিবি দানশীল রাজা হিসেবে চিত্রিত।

সীতা: মিথিলার প্রসিদ্ধ জনকবংশীয় রাজা ধর্মধ্বজের পালিতা কন্যা। সীতা শব্দের অর্থ লাঙলের রেখা। জনক-কন্যা বলে 'জানকী' এবং বিদেহ-দেশের রাজকন্যা বলে 'বৈদেহী'। মহাদেবের দক্ষযজ্ঞনাশক 'সুনাভ' ধনুখানি (হরধনু)-তে জ্যা-আরোপণের ফলে বিশ্বামিত্রশিষ্য ত্রয়োদশবর্ষীয় রামচন্দ্রের হাতে ষষ্ঠবর্ষীয়া সীতাকে সম্প্রদান করেন ধর্মধ্বজ। পতিব্রতা নারীর আদর্শ। এঁকে অপহরণের কারণেই প্রায় সবংশে দশানন বধ হয়। লঙ্কার বন্দীদশা হতে মুক্তির পর অগ্নি-পরীক্ষাকালে সীতার ঋজু উক্তি: "যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ। / তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥" (রামায়ণম্ ৬/১১৬/২৫)। 'আমার হৃদয় যদি কখনো রাঘব হতে বিচলিত না হয়ে থাকে, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

সাবিত্রী: বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রের দেবী। যা হতে সমূহ লোকের সৃষ্টি, তিনি সবিতা; এই সবিতা যাঁর দেবতা, তিনি সাবিত্রী। মহাভারতে ইনি মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির কন্যা। মাতা মালতী। শাল্ব দেশের বিতাড়িত রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীর নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে মৃত্যু-দেবতা যমরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর টানাপোড়েন কিংবদন্তীতে পরিণত।

দময়ন্তী: বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। নিষধরাজ নলের স্ত্রী। নল-দময়ন্তীর কাহিনী সর্বজনবিদিত।

অরুন্ধতী: বশিষ্ঠের স্ত্রী। অপর নাম উর্জা। প্রজাপতি কর্দমের ঔরসে দেবাহুতির গর্ভে জন্ম। অত্যন্ত বিদুষী ও তপস্বিনী। পতিভক্তির আদর্শ। কুশণ্ডিকার সময় মন্ত্রপাঠকালে নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবার নিয়ম আছে। দক্ষযজ্ঞে অনেকের সঙ্গে বশিষ্ঠও মারা যান। ফলে অরুন্ধতী সহমৃতা হন। অনন্তর দু'জনে দু'টি নক্ষত্রে পরিণত হন।

লোপামুদ্রা: মহামুনি অগস্ত্যের স্ত্রী। বিবাহের পর স্বামীর নির্দেশে রত্নাভরণ ত্যাগ করে বল্কল সম্বল করে গঙ্গাতীরে স্বামীর সঙ্গে তপস্যা করতে থাকেন।

ঔশীনরী : উশীনর দেশের এক শূদ্রক কন্যা। মহর্ষি গৌতমের ঔরসে এ'র গর্ভে কক্ষীবান প্রমুখ সন্তান হয়।

৩২. স্যার আশুতোষ সংগীতের যথার্থ সমঝদার ছিলেন বলে মনে হয় না। অন্যথায় তিনি বক্ষ্যমান পংক্তিটি কখনোই লিখতেন না। বস্তুত, দীপক এবং বেহাগ রাগ একই সময়ে গেয় : রাত্রির তৃতীয় প্রহর (রাত ১টা হতে ভোর ৪টে)। অপর দিকে, পূরবী চর্চার সময় দিনের চতুর্থ প্রহর (অপরাহ্ণ ৪টে হতে রাত ৭ টা)। পূরবীকে সন্ধিপ্রকাশ রাগও বলা হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, রাগের সময়-পরিকল্পনা অতি প্রাচীন ব্যাপার নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরেই রাগের সময় নির্ধারণ শুরু হয়েছিল। ১৫শ-১৬শ শতকে রচিত 'সংগীত মকরন্দ' গ্রন্থে রাগের সময় নির্দেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

৩৩. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন-মরীচিকা' কবিতার ছত্র মনে করিয়ে দেয় ; যথা—"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়" ইত্যাদি। কবিতাটির প্রথম প্রকাশ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এর ৩০ বৈশাখ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যায়। পরে 'কবিতাবলী' পুস্তকে সংকলিত হয়।

৩৪. রামায়ণে বাল্মীকির উক্তি। পুরো শ্লোকটি এইরূপ :

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥" (১।২।২৫)।—

"নিষাদ, তুমি চিরকাল পতিত থাকিবে। যেহেতু তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করিয়াছ।" (অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থের অনুবাদ। দ্র. রামায়ণের চরিতাবলী, ১ বৈশাখ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, 'নিবেদন' অংশ, পৃঃ ১০)।

৩৫. অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র জানিয়েছেন, অভিভাষণে উল্লিখিত 'বন্ধুবর সতীশচন্দ্র'-এর পুরো নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই সি এস। ইনি নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস-স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহোৎসবের ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। (দ্র. জাতীয় সাহিত্য / ৫ম সংস্করণ ১৯৪৯ ইংগাব্দ / পৃঃ ৯০)। সতীশচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে চেষ্টা সত্ত্বেও এর বেশি জানা সম্ভব হয়নি।

৩৬. (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের সপ্তম কবিতা 'কৃত্তিবাস' হতে গৃহীত। উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ (১৮৬৬ ইঙ্গাব্দ)।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি!"[১]

বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ কবিভূষণ[২] ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, যে মহাকবির স্মৃতি-বাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি, শুধু বঙ্গের নহেন, সমগ্র ভারত-বর্ষের বরণীয় ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহা-কবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্রদিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র[৩] প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্নকল্পিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য, বাঙ্গালার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা যে, অতিবড় নীরস পাষাণেও এখানে নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই

"পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।"[৪]

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লীপ্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দোয়েল-শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়, এই বাঙ্গালার পল্লীকুঞ্জে যাঁহারা গান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা আবার ভাগ্যবান্, বিধাতার অনুগ্রহ যাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাঁহারা ঐ ভাবাবেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হন, মরজীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লীপদবাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকায় পথিকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্ত্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সান্ধ্য সমীরণে যেন

কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে সুপ্ত বীণা আপনিই অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে,—তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চিরপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া মুদ্রিত নেত্রে বলে,—

"মধুর মূরতি তব ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"[৫]

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিণী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনও ধ্যান করে, কখনও আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ময়ীকে ধরিতে যায়; সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনও শোকাশ্রুতে ধরণী ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখন-বা মরুভূমিকে অমরধামে পরিণত করে। তখন তাহার

"সে শোক-সঙ্গীত-কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়!
নিরখি নন্দিনীচ্ছবি
গদ্‌গদ্‌ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া যায়!"[৬]

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতিনিঃশ্বাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সাধক-কবি তখন বুঝিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি কি করিতেছেন, কি গাহিতেছেন। তাঁহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের "মা নিষাদ"[৭] গীতিকা যে জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতে পান না। কবি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে অনিমেষে চাহিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ে বলেন,

"এস মা করুণা-রাণী,
ও বিধু-বদনখানি
হেরি, হেরি, আঁখি ভরি হেরি গো আবার!
শুনে সে উদার কথা—
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর!"[৮]

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে কালে এক নব মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না।

এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি[৯] মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদিকবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত,[১০] তখন চতুর্ম্মুখ[১১] স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে[১২] আশ্বস্ত করিয়া দিলেন; বলিলেন, "ঋষিবর, তুমিই জগতের আদিকবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়! এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা, শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কশায় মহাকবি কীট্‌সের[১৩] হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। হায়! অকালে ক্ষয়রোগে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল!

বঙ্গের কবিতাসুন্দরীর রাতুল চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্য দেবতার দুর্দ্দশায় ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাঁদিতে কাঁদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপে বেড়ি। কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।

... ...

চীন-নারী-সম পদ কেন লোহ-ফাঁসে।"[১৪]

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগলপারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দাম ভাবে বিচরণ করিতে চায়,—তাহার সমক্ষে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া এক অতি মনোরম নবীনতায় সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী,"[১৫]

এই কবি-বাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা জন্মে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন—আপনার ইহকাল, পরকাল, সুখদুঃখ, সম্পদ্‌বিপদ্‌, পুত্রকলত্র সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্ত গ্রহের" ন্যায় দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া কবিতাসুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন—একাগ্র হৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্য-পরতন্ত্রা" ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্ম-বাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মাগো, এ মোর মিনতি।"[১৬]

তাহার 'মিনতি' সফল হইয়াছে। শুধু 'হিয়া' নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ-মন সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার রাঙ্গা চরণে "মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি" দেখিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল,[১৭] তাহা উপরিধৃত কয় পঙ্‌ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাকে ডাকিব—আমার সেই ডাকে সমগ্র গৌড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে—

আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি, আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উন্মুক্ত চরণে, বনকুরঙ্গীর মত স্বৈর চরণে ইতস্ততঃ বিচারণ করিবেন, আর পুত্র আমি 'মা মা' বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ নিগড়মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি?—কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজল-নয়নে বলিলেন,

"ছিল নাকি ভাব-ধন, কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে!
কি কাজ রঞ্জনে রাঙ্গি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজজ্বল আকাশে।"[১৮]

লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের[১৯] প্রবর্ত্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর ঝিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর মধুসূদনের ওজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"[২০]

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে—তাঁহার চিরপ্রিয় গৌড়জনকে—এমন সুধা পান করাইবেন,[২১] যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন? এখন জাগ্রত করিতে হইবে। তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই—তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মস্‌লা নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জগতের ভালমন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্ত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্য রাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ-

রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়—মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি ? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস।

মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের অমিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার[২২] পরিবর্ত্তে বীরাঙ্গনার ভূষায় ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন,—কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। নাটকপ্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অন্যভাবে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। মধুসূদনের যে কম্বুনাদে বঙ্গসাহিত্য গগন মুখরিত, তাহার এক ভগ্নাংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও[২৩] বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনও এক ভাবে একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না,—সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু,—কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধু-বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। মাইকেল সর্ব্বপ্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন,[২৪] তখন তিনি প্রথম কবিতাটি তদীয় প্রিয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন :

"What say you to this, my good friend ? In my humble

opinion, if cultivated by men of genious, our sonnet in time would rival the Italian."

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সনেটটি কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল-জীবনীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই :

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন-শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, "হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি ? কহ ধনপতি !
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

এই কবিতা-রচনার অনেক পরে মাইকেল "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়া যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন, এইটি তাহার দ্বিতীয় কবিতা[২৫] ; মনে হয়, উদ্ধৃত কবিতাটি মাজিয়া-ঘষিয়া কবিবর "বঙ্গভাষা" নামে বাহির করেন ; কেন-না প্রথমের কথা ভোলা বা প্রথমের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।[২৬]

তিলোত্তমা-রচনার পর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মাইকেল হাত দেন।[২৭] তিলোত্তমা অমিত্রচ্ছন্দের একপ্রকার প্রথম কাব্য। বোধ হয় বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তিলোত্তমার প্রতি প্রথম প্রথম তত সদয় ব্যবহার করেন নাই। মাইকেল যদিও কখনও আত্মমতানুযায়ী কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কবিতা লেখেন নাই, তবুও কিন্তু বঙ্গের নূতন ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার আদরিণী তিলোত্তমাকে অন্যে আদর করিতেছে দেখিয়া, আনন্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন:

"You will be pleased to hear that the Pandits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagore has at last condescended to see 'great merit' in it, and the 'Shome Prakash' has spoken out in a favourable manner."

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ প্রকাশবিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ-সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল-কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়! বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"In this respect, I must thankfully acknowledge I am singularly fortunate. All my idle things find patrons and customers * * * *" তাঁহার 'idle things' গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্ব্বের কারণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর[২৮] প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা-গুলিরও প্রত্যেকখানি সেইরূপ এক একটি অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্য কোনও কাব্যে আছে কি-না, বা কালে থাকিবে কি-না, তাহা বলিতে পারি না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা যখন পড়ি, দ্বারকানাথের উদ্দেশে রুক্মিণীর সেই পত্র—সেই,

"সরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি,—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে।
লইনু শরণ আজি ও-রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে।
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব শ্রীপতি।
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বনমাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি, কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী-শুক, ময়ূর-ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে, ফোটে ফুলরাজি।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে।"[২৯]

এই অনুপম পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পাঠ করি, তখন যথার্থই আত্মবিস্মৃত হই, কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি-চাতুর্য্য-দর্শনে ও শব্দ-গ্রন্থনের অনুপম কৌশলে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। তখন

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপি বা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥"[৩০]

আলঙ্কারিকের এই উক্তির প্রকৃত অর্থবোধ হয়। এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদ-রচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা—ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা অপূর্ব্বশ্লাঘা অনুভব করি। যখন

"এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন।
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তারে করিব বন্ধন।
হ্যাদে, তোর পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধা-বিনোদন?
কি কহিলি, কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ, ধনি।
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?"[৩১]

প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার বিষাদ-গীতিকা শ্রবণ করি, তখন এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুধ্বনি মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাই।

আবার—

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কা'র হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি। ভিখারী রাঘবে?"[৩২]

প্রমীলার এই মেঘচন্দ্রধ্বনির সহিত ব্রজাঙ্গনার ঐ মধুধ্বনি মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, বিধাতা কি অপূর্ব্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায় মধুর কল্পনা-প্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন। কল্পনা সহচরীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। কোনও কল্পনার মন্দতায় বা ভাবের অল্পতায়

তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোনও কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছায়া যেন স্বতঃই লাগিয়া আছে। বঙ্গ কাব্য-কাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্ব্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন,— কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল,—যে পথে চলিয়াছি ইহাতে কোথায় কতদূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব,—যে পাথেয় আছে তাহাতে কুলাইবে কি-না, এই সব ঐহিক হিসাবনিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই "নিয়তিকৃত-নিয়ম-রহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্য-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা"[৩২(ক)] ছিল। মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনা-সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, "যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে", কহিতেন; "শুন যত গৌড়-চূড়ামণি"—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা তারা বিলাইবার জন্য স্বদেশ-বাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"[৩৩]

এই কবিবাক্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদিকবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।"[৩৪] তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল; সেই উন্মাদনার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কবিবর দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন।—অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই, —ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবা-রজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গকবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেকখানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতাইশ পঙ্‌ক্তি কেবল বঙ্গকবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্লভ প্রেম-রত্নে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন

কবিতা। কখনও তিনি ভারত-সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুক্তা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখনও আবার

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল—কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;"[৩৫]

কখন বা—

"কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে,"[৩৬]

"গোপিনীর, হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই "বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণ কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বীণায় বিরহ-সঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর-মহাসাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত-সাগরে" - অন্য সাগর নহে ; পাশ্চাত্ত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবি-জীবনের দুইটি স্তর আমরা দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্ব্ব কাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তাঁহার যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্ব কালে গ্রথিত, আর হেক্টর-বধ, মায়াকানন এবং কবিতামালা[৩৭] তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি পূর্ব্বে "ভারত সাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারত সাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই— প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভার্সাই নগরে, কিন্তু তাহার জন্মগ্রহণ এই ভারতবর্ষে। রাজনারায়ণবাবুর[৩৮] নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেট্‌টি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণবাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট্‌ আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতা পুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন

বা যাহাই করুন না-কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

"পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি,—
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,—"[৩৯]

বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে সারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া-দশমী,[৪০] কপোতাক্ষ নদ[৪১] কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী[৪২] খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীদেশে বসিয়া—বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিত-প্রায় সেই স্থানে বসিয়া—তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না-জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভার্সাইয়ে বসিয়া কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর সাগর-দাঁড়ীর অনতিদূরে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাংলার ফুল, বাংলার ফলে,—বাংলার মাটি, বাংলার জলে"[৪৩] তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীদেশে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেন :

"আর কি কাঁদে লো, নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে, তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা মুকুতার কমরূপ ধরি ?"[৪৪]

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধুহীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গলার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 'শ্যামা' বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

"মধুহীন করো নাক তব মন-কোকনদে।"[৫]

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে।

সভ্যবৃন্দ, কৃত্তিবাস কাশীদাশের দেশে, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব মুকুন্দরাম চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের[৪৬] দেশে মধুসূদনের জন্ম ; যে দেশের নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানীতে শ্যামা দোয়েলের সঙ্গীত, সুনীল তটিনীতে দাঁড়িমাঝিদের সারিগান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম ; যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল-বালক

"হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হল' পার কর আমারে—"[৪৭]

বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়,—মধুর সেই দেশে জন্ম, তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থায় অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতামাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদে বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত। রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বিনিময়ে যে রত্ন লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিত্ব-রত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে ?

শুভক্ষণে মধুসূদন ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"...... .... অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি। যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
....
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
....
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি।............
.... উর তবে, উর দয়াময়ি,

বিশ্বরমে ! গাইব, মা ! বীররসে ভাসি
মহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া ।[৪৮]

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সংগে তদ্দেশবাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষার দিবাকর-কল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবা-রজনী আনন্দে মধুপান করিতেছে ও করিবে। বংগ-ভাষাকে তিনি যে সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে "কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভায়" বংগভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোনও দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বংগকবিতা-সাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্‌জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনি ভাবে, বুঝি-বা ততোধিক রূপে, বংগভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরংকুশ বিধানে কত-কি ভাংগিবে-গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্ব-প্রতিভার জ্যোতি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছে ; আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া আমরাও ধন্য হইতেছি।

আহা !

"বংগভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
গিয়াছে,—বংগের মধু বংগ পরিহরি।

যাও তবে কবিবর, কীর্ত্তিরথে চড়ি,
বংগ আঁধারিয়া ;
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, কৃত্তিবাস কালিদাস,—
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে,
অনন্ত কালের তরে, গৌড়মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।"[৪৯]

উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য :

১. মধুসূদনের মৃত্যুর পরে (মৃ. ১৮৭৩ ইঙ্গাব্দের ২৯ জুন) লিখিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্গারোহণ' কবিতা হতে গৃহীত। কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে (১২৮৩ বঙ্গাব্দে) প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়।

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭—১৯২৭ ইংগাব্দ)। জন্ম অধুনা ২৪ পরগনা জেলার (ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকটে) নিতাড়া গ্রামে। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে জীবনচরিতকার হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' অদ্যাবধি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। সাপ্তাহিক 'সুরভি' পত্রিকা (১২৮৯ বংগাব্দ) সম্পাদনা করতেন। ১৯১৭ ইংগাব্দে এক প্রকাশ্য সভায় স্যার আশুতোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যোগীন্দ্রনাথকে 'কবিভূষণ' উপাধি দেন।

৩. কৃত্তিবাস : 'কৃত্তিবাস' অভিভাষণের ৫, ১৯, ২২, ২৪-২৭ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

কাশীদাস : কাশীরাম দাস। মহাভারতের অনুবাদক। সম্ভবত আংশিক ; কারণ, কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত মহাভারতের শেষাংশের সঙ্গে প্রথম অংশের রচনাগত তথা ভাবগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ইন্দ্রানী পরগনার অন্তর্গত সিংগগ্রামে কাশীরাম বর্তমান ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। অনূদিত মহাভারতের আদিপর্বের উপসংহারে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কাশীরাম দাস বলেছেন : "কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংগ গ্রাম। / প্রিয়ংকর দাস সুত সুধাকর নাম ।। / তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। / কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ।।" মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কাশীরাম দাস পথিকৃৎ নন। কারণ এ'র পূর্বেই আমরা পেয়েছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, গংগাদাস সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনকে। তবে ১৮০২ ইংগাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হতে উইলিয়ম কেরীর উৎসাহে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কলংকারের সম্পাদনায় কাশীরাম দাসের নামে ৪ খণ্ডে সমগ্র মহাভারত প্রকাশিত হওয়ার ফলে মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাসের নাম সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করে।

রামপ্রসাদ : 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ৪ ও ২৮ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

ভারতচন্দ্র : উক্ত অভিভাষণের ২৮ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত গানের পংক্তি। গানটি সম্মেলক-গীতি হিসেবে 'সাজাহান' নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (তৃতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য)। গানটির সূচনা এইরকম : "ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;" এবং উল্লিখিত পংক্তিটির পূর্ণরূপ হল : "তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে—"।

৫. বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' গ্রন্থের 'উপহার' শীর্ষক উৎসর্গ-গীতি হতে গৃহীত। উল্লিখিত পংক্তিগুলির মধ্যে একটির পাঠান্তর আছে। "সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার।" (দ্র. বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ সংস্করণ, পৃ. ১০৭)।

৬. সারদামঙ্গল / প্রথম সর্গ / ১৭ সংখ্যক গীতি।

৭. 'কৃত্তিবাস' অভিভাষণের ৩৪ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

৮. সারদামঙ্গল / প্রথম সর্গ / ২০ সংখ্যক গীতি।

৯. বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম আমদানির সুবাদেই মাইকেলের নামের পূর্বে এই বিশেষণ।

১০. দেবর্ষি নারদের মুখে ইক্ষ্বাকু বংশজাত রামের গুণকীর্তন শুনে শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে করে বাল্মীকি তমসা-নদীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় এক ব্যাধ কর্তৃক কামমত্ত এক ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক)-কে রক্তাক্তকলেবরে ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে ব্যাধের উদ্দেশে বিখ্যাত 'মা নিষাদ' অভিশাপ উচ্চারণ করে বসেন। কিন্তু অভিশাপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয় যে, ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতর হয়ে এ তিনি কী করলেন ? আলোচ্য পংক্তিতে স্যার আশুতোষ এই তথ্যই বোঝাতে চেয়েছেন।

১১. প্রজাপতি ব্রহ্মার অপর নাম। কপিলা-কন্যা তিলোত্তমা দেবতাদের যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন তাঁর প্রতিটি গমন-পথে দৃষ্টি রাখার কারণে ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখ হয়, তাই ব্রহ্মা 'চতুর্মুখ'।

১২. মহর্ষি বাল্মীকির দস্যু-জীবনের নাম। কথিত আছে, অল্প বয়সেই দস্যু হয়ে গড়েছিলেন রত্নাকর। সংসার প্রতিপালনের জন্য বনের মধ্যে পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হত্যা করতেন। এইভাবে একদিন দেবর্ষি নারদ ও প্রজাপতি

ব্রহ্মাকেও হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর এই পাপের ভাগী কে হবেন—সেই প্রশ্নে রত্নাকর নিজেকে একমাত্র দোষী বুঝতে পেরে নারদ ও ব্রহ্মাকে মুক্তি দিয়ে তাঁদের কাছে নিজের মুক্তির উপায় জানতে চান। নারদের উপদেশে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। তিনি হন বাল্মীকি। তাঁর সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। জানকীর পাতাল প্রবেশের আগে ইনি নিজেকে প্রচেতসের দশম পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। রামায়ণে কুশ-লব এঁকে 'ভার্গব' বলেছিল (৭।৯৪।২৬)। রামায়ণ মতে, দশরথের ইনি সমবয়স্ক ও সখা ছিলেন (৭।৪৭।১৭)। এছাড়াও, 'কৃত্তিবাস' অভিভাষণের ২ সংখ্যক উল্লেখপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

১৩. ইংরেজ কবি জন কীট্স। ১৭৯৫ ইংগাব্দের ৩১ অক্টোবর লণ্ডন শহরে জন্ম। পিতা টমাস কীট্স। জন অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। ফলে, মাতামহীর তত্ত্বাবধানে শৈশব কাটে জন-এর। ১৮১৬-তে চিকিৎসাশাস্ত্রে লাইসেনসিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন জন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ের পরিবর্তে কাব্য-চর্চাতেই দিন কাটানোর সংকল্প করেন। ১৮১৭-তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস' প্রকাশিত হয়। ১৮১৮-তে ক্ষয়রোগাক্রান্ত। এই রোগযন্ত্রণা ভোগেই তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। উপরন্তু ছিল ফ্যানি ব্রন-এর সংগে প্রণয়ে অসাফল্য এবং তাঁর 'এণ্ডিমিয়ন' (পুরাকাহিনী-নির্ভর দীর্ঘ কবিতা)-কে ঘিরে সমালোচকদের সম্মিলিত আক্রমণ। ১৮২০-তে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় ইতালি গমন। সেখানকার রোম নগরীতে ১৮২১ ইংগাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু।

১৪. মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) 'মিত্রাক্ষর' হতে গৃহীত। অভিভাষণে প্রথম পাঁচ পংক্তি এবং শেষের পংক্তিটি উল্লিখিত হয়েছে। সনেটটি কবির 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের ৯৭ সংখ্যক কবিতা।

১৫. পূর্ণ শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥"

১৬. 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ১৯ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য। অভিভাষণে সনেটের শেষ ছয় পংক্তি গৃহীত হয়েছে।

১৭. প্রসংগত তুলনীয় মোহিতলাল মজুমদারের 'পয়ার' শীর্ষক সনেট। মোহিতলাল লিখেছিলেন : "মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ-বিলাসিনী।/ কতকাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে / ...কবি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল

শ্রীমধুসূদন / পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;" (দ্র. স্মর-গরল, চৈত্র ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১০৫)।

১৮. 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'মিত্রাক্ষর' শীর্ষক সনেট দ্রষ্টব্য। অভিভাষণে ষষ্ঠ হতে দশম ছত্র উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, বক্ষ্যমান উদ্ধৃতিকে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'মিত্রাহার' কবিতা বলেছেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, ১৯৪৯ পঞ্চম মুদ্রণ, পৃ. ৯০, উল্লেখপঞ্জী সংখ্যা ৪৩), কিন্তু ওই নামে কোন কবিতা 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে নেই

১৯. অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দ। এর সকল পাদের ৫ম অক্ষর লঘু, ৬ষ্ঠ গুরু, এবং ২য় ৪র্থ পাদের ৭ম লঘু। উদাহরণ : "আইল নৃপবালিকা বাজিল কর তালিকা। / দোলত ফুলমালিকা সা মনসিজনালিকা।" (দ্র. বাসবদত্তা / মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, প. ১৩৮)।

২০ নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যের পংক্তি। চতুর্থ সর্গ, 'যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ১০ম সংস্করণ, পৃ. ৮২।

২১. 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে ৩১-৩২ সংখ্যাক পংক্তি স্মর্তব্য : " . রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে / আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

২২. মদালসা : মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর তত্ত্বদর্শিনী কন্যা। রাজা শত্রুজিৎ-তনয় ঋতধ্বজের স্ত্রী। এঁদের পুত্র বিক্রান্ত, সুবানু, শত্রুমর্দন এবং অলর্ক। কথিত আছে, মদালসা চার পুত্রকেই বৈরাগ্য-শিক্ষায় এমন পারদর্শী করে তোলেন যে, সকল পুত্রই রাজ্য-শাসনে নিস্পৃহ হয়ে ওঠে। মদালসার উপদেশ ছিল 'সতাং সঙ্গঃ'। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার বিস্তৃত কাহিনী বিধৃত আছে।

২৩. 'জাতীয় সাহিত্য' গ্রন্থে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কিত একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "হিরন্ময়েন জ্যোতিষা সত্যস্যাপাবৃতং মুখম্"। (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, ১৯৪৯ সংস্করণ, পৃ. ৯০)। অবশ্য ঈশোপনিষদেও অনুরূপ একটি শ্লোকের সন্ধান আমরা পাওয়া যায় : "হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। / তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥" (১৫ শ্লোক)। আবার, মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুতে কবি হেমচন্দ্র তাঁর 'স্বর্গারোহণ' কবিতায় ত্রিপদী ছন্দে লিখেছিলেন : "খোল খোল দ্বার খোল

দ্রুতগতি, / হিরন্ময় জ্যোতি যার, / বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে, / মুখেতে প্রীতির ভার।"

২৪. মধুসূদন কবে প্রথম পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় হাত দেন তার সঠিক সন-তারিখ নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। কারণ কবি নিজে এ-ব্যাপারে যে-সূত্রটুকু দিয়েছেন, তা হল : বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি তারিখবিহীন পত্র। সেখানে কবি লিখেছেন : 'I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following :—' বলে 'কবি-মাতৃভাষা' শীর্ষক নমুনা পেশ করেন ; যার প্রারম্ভিক পংক্তি "নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন / অগণ্য ;" সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রের সময় অনুমান করেছেন ১৮৬০ ইংগাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ কিছু বলেননি। আবার, ফ্রান্সের ভার্সাই (Versailles) হতে ১৮৬৫ ইংগাব্দের ২৬ জানুয়ারি লিখিত পত্রে মধুসূদন বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানাচ্ছেন যে তিনি চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। এবং এরপরই দেখা যাচ্ছে, ১০২ খানি সনেট সহ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' শীর্ষক গ্রন্থ ১৮৬৬ ইংগাব্দের ১ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে।

২৫. 'কবি-মাতৃভাষা' কবিতাটিকে স্যার আশুতোষ কীভাবে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের 'দ্বিতীয় কবিতা' নির্ণয় করলেন বোধগম্য হল না। কারণ কবির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপিতেও দেখা যায়, দ্বিতীয় কবিতা নামকরণবিহীন এবং তার বিষয়বস্তু 'কাব্যের কানন' ইতালি দেশের প্রশস্তি। কবিতাটির প্রারম্ভিক পংক্তি : "ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন," বস্তুত, 'কবি-মাতৃভাষা' কবিতাটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিতই ছিল।

২৬. "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের ৩য় সংখ্যক কবিতা।

২৭. ১৮৫৯ ইংগাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য'-এর প্রথম দু'টি সর্গ রচিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র জুলাই-অগাস্ট ১৮৫৯ সংখ্যায় প্রথম সর্গটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পরের সংখ্যায় দ্বিতীয় সর্গ মুদ্রিত হয়। কিন্তু কোনোবারই কবির নাম প্রকাশিত হয়নি। চার সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যের ৩য় ও ৪র্থ সর্গ কোনো সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়নি। কাব্যটি পুস্তকাকারে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হতে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ ইংগাব্দের মে মাসে। এই

প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অপরদিকে, ১৮৬৫ ইংগাব্দের গোড়ায় ইউরোপে বসে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনায় হাত দেন মধুসূদন। (বক্ষ্যমান অভিভাষণের ২৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৮. কালিদাস-বিরচিত তিনটি মহাকাব্যের সন্ধান এ-পর্যন্ত মিলেছে। সেগুলি হল: সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত 'কুমারসম্ভবম্' (এর প্রথম আটটি সর্গকেই 'খাঁটি' মনে করা হয়; মল্লিনাথ এই আট সর্গের ওপরই টীকা লিখেছিলেন; পরবর্তী সর্গগুলির বিষয়বস্তুর শোভনতা সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে); ঊনবিংশ সর্গে রচিত 'রঘুবংশম্'; এবং 'মেঘদূতম্'।

২৯. 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী' শীর্ষক তৃতীয় সর্গের ১১৭-১৩৫ পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থাকারে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম প্রকাশ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন (১৮৬২ ইংগাব্দ)।

৩০. সে কবিতায় বা সে বনিতায় কী কাজ যার পদবিন্যাস মাঝে মন মুগ্ধ না হয়।

৩১. 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম সর্গের ১৬ সংখ্যক 'সখী' কবিতার ৬ এবং ৭ স্তবক। কাব্যটির প্রথম প্রকাশ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ় (জুলাই ১৮৬১ ইঙ্গাব্দ)।

৩২. দ্র. 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তৃতীয় সর্গের ৭৫-৮০ পংক্তি।

৩২(ক). কাব্যপ্রকাশ, ১।১।-এ আছে: "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্। / নবরসরুচিরাং নির্মিতিমদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥"

৩৩. দ্র. 'জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি' শীর্ষক অভিভাষণের ১ সংখ্যক টীকা।

৩৪. দ্র. 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'বঙ্গভাষা' শিরোনামে ৩ সংখ্যক কবিতার শেষ পংক্তি।

৩৫. উক্ত গ্রন্থের 'উপক্রম' শিরোনামে ১ সংখ্যক কবিতার ৬-৮ পংক্তি।

৩৬. একই কবিতার নবম পংক্তি।

৩৭. 'হেক্টর বধ'-এর প্রকাশকাল ১৮৭১ ইংগাব্দের ১ সেপ্টেম্বর; রচনাকাল ১৮৬৭ ইঙ্গাব্দ। 'মায়াকানন'-এর রচনাকাল ডিসেম্বর ১৮৭২ ইঙ্গাব্দ;

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মধুসূদনের তিরোধানের পর মার্চ ১৮৭৪ ইঙ্গাব্দে। 'কবিতামালা' অসম্পূর্ণ স্কুলপাঠ্য কবিতা-পুস্তক।

৩৮. রাজনারায়ণবাবু : মধুসূদনের বন্ধু রাজনারায়ণ বসু। কবির বান্ধব-জীবনে গৌরদাস বসাকের পরই এঁর স্থান। কিন্তু গৌরদাসকে কবি সাতখানি বিক্ষিপ্ত ইংরেজি কবিতা উৎসর্গ করলেও রাজনারায়ণকে কোনো রচনাই উৎসর্গ করেননি।

৩৯. দ্র. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বঙ্গভাষা' শিরোনামে ৩য় সংখ্যক কবিতার ৩-৭ পংক্তি।

৪০. মাঘ মাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতীর আরাধনা এবং আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী হতে নবমী তিথি পর্যন্ত শারদা বা দুর্গার অর্চনা ; এই অর্চনার পর দুর্গার বিসর্জনের দিন বিজয়া দশমী।

৪১. কপোতাক্ষ নদ : বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের জেলা ও শহর যশোহরের এক প্রধান নদ। ওপার বাংলায় এর পরিচয় 'কপোতাক্ষী' নামে। মাইকেল মধুসূদনের লেখনীতে 'কপোতাক্ষী' হয়েছে 'কবতক্ষ'। "যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে জন্মভূমি," (দ্র. 'সমাধি-লিপি' কবিতা)। কবি কবতক্ষের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বলেছেন : "সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে। / ··· বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, /কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? / দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।" (দ্র. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৩৪ সংখ্যক কবিতা)।

৪২. ঈশ্বরী পাটনী : ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি চরিত্র। 'অন্নদামঙ্গল'-এ আছে যে "গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম।। / তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।" "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা (সেই) গাঙ্গিনীর (ছোট গাঙ) তীরে। / ··সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।" ঈশ্বরী পাটনীর প্রকৃতি আজো রহস্যাবৃত। অভিধান অনুসারে, 'ঈশ্বরী' স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু ভারতচন্দ্র—এই চরিত্র নারী না পুরুষ—তার আভাস কোথাও দেননি। এটা ঠিক যে, পারানি মাঝি বলেই ঈশ্বরী 'পাটুনী' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছে। একজন নারীর পক্ষে খেয়াঘাটে নৌকাচালনে নিযুক্ত হওয়া যে বিচিত্র কিছু নয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের 'সত্যবতী' চরিত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সে যমুনার খেয়াঘাটে পাটুনীর কাজ করত। তাছাড়া, অন্নপূর্ণার কাছে ঈশ্বরীর যে-প্রার্থনা "আমার সন্তান যেন থাকে

দুধে ভাতে", এ তো যে-কোনো মাতৃ-হৃদয়েরই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। 'ঈশ্বরী পাটুনী'-কে নিয়ে মধুসূদন যে-প্রশস্তি গেয়েছেন, তা তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে ৩৫ সংখ্যক কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।

৪৩. 'বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ১৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৪. দ্র. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'ব্রজ-বৃত্তান্ত' শিরোনামে ৯৮ সংখ্যক কবিতার ১—৪ পংক্তি।

৪৫. 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতার ৩য় পংক্তি। এর রচনাকাল : জুন ১৮৬২ ইঙ্গাব্দ বলে অনুমান করা হয়েছে। কারণ ৯ জুন মধুসূদন ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন। তার অব্যবহিত পূর্বে ৪ জুন রাজনারায়ণ বসুকে যে-পত্র লিখেছিলেন, সেখানেই কবিতাটির প্রথম প্রকাশ। কবির জীবৎকালে এই কবিতাটি অগ্রন্থিত-ই ছিল।

৪৫. জ্ঞানদাস : চৈতন্য পরবর্তী অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব পদকর্তা। তিনি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে জ্ঞানদাসকে নিত্যানন্দ শাখাতেই গণনা করা হয়েছে। জ্ঞানদাসই প্রথম বৈষ্ণব কবি যিনি 'ষোড়শ গোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করে উৎকৃষ্ট পদরচনা করেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস'-এর বিবরণ হতে জানা যায় যে, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন। জাহ্নবাদেবীর সঙ্গেই কাটোয়া ও খেতুরির বৈষ্ণব মহোৎসবে যোগ দেন। জ্ঞানদাস ব্রজ-বুলিতে পদ-রচনা করলেও তাঁর সমধিক পরিচিতি বাংলা পদকর্তারূপে। তাঁর রচনা যেমন সরল তেমনি অলঙ্কার-বাহুল্য-বর্জিত। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। / প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।" অথবা "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আনলে পুড়িয়া গেল।" জ্ঞানদাসের এ-রকম পদ সর্বজনবিদিত। ১৫২০ হতে ১৫৩৫ ইংগাব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণকুলে জ্ঞানদাসের জন্ম বলে অনুমান করা হয়। তাঁর নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার (পূর্বে বীরভূমের অন্তর্গত) কাঁদড়া গ্রামে। পূর্ব রেলের কাটোয়া—আহমদপুর ন্যারো গেজ শাখায় আজো একটি স্টেশনের নাম 'জ্ঞানদাস কাঁদড়া'।

৪৭. হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথের পদ। তবে আলোচ্য পংক্তিটি নিয়ে পাঠভেদ আছে। হরিনাথের পদে আছে : "ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে। / তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে,

তোমারে ।।" (দ্র. 'হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)' / ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৩৬-৩৭)।

৪৮. দ্র. 'মেঘনাদবধ কাব্য'; প্রথম সর্গ; ৯-১২, ১৫, ২০-২১, ২৬-২৮ পংক্তি।

৪৯. দ্র. নবীনচন্দ্র সেনের 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক কবিতা। কবিতাটি ২৯ জানুয়ারি ১৮৭৮ ইঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের ২য় খণ্ডে ষষ্ঠ কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"[১]

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে—বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান বঙ্গবাণীর স্বর্ণ মন্দির-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন ; রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার[২] প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য।[২(ক)] বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ,[৩] সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণ রূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বৃদ্ধিক্ষু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা সাপেক্ষ। যে সময়ে জল সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের

প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন;—কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্‌ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়,—তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত—কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর-সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্যরথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা সাত কোটি[৪] বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন

সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্ব প্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পাধিকতর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা-গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন, যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী

শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে যেখানে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিত-গণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি-বেশীদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকট অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন-না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না—সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনাসহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান মনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত-পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতাকেই শিক্ষার চরমফল-প্রাপ্তি বলতে পারি না।

স্বজাতিকে আত্ম-মতের অনুকূল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যেরদ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপূর্ণ

চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গ-ভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার ন্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী-শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষা-বর্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্‌যোক্তা বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী-শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেন-না তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন ;—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতি-নীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"[৫]

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে ; তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে—সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে—সৎপথে পরিচালিত

করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে—অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরল-বিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্-বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎ পথেই লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্ত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু' একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি-না, তাহার প্রয়োগে এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে

হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়-প্রণালী অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা ; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই,—অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব-মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটিতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতি পদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়-বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহ কালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহ কালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিক-বাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয় সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তারপর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্যনাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী-শিক্ষিত-গণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষত তারুণ্যের অরুণ-আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়—হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান-সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাস-কৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কি-না,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি-না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি-না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণজনক, সেইগুলি আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে ; সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"[৬]

এই ভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাত জাতীয়তা সুগঠিত হইবে এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব,—অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি-সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয় তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না,—যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য ; আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা আত্ম-পর-জ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া, ইহার

অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম তাহাই নহে, তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ;—যেমন ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন, এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহ-পদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার-পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর-সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ উত্তর-কালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর—যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহ-পদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ; সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর ; এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর। তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ-বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে,

এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই—মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই—তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও; তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও এবং দেখিয়া তুলনা করিয়া ভালমন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া অন্য দেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও—তাহাদের মনে আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল; তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে—নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভা (বা পার্লিয়ামেণ্ট); তোমার দেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোক-তন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশের পক্ষেও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ভেদে, দেশের পরিচালন-সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর এবং দেশবাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোন্টা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায় নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য-গঠন কর—দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার আশা বিফল হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত তাহাতে আশু ধান্যের বীজ-বপনে মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ-ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে—পরন্তু দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির ছায়াপাতে সেই

দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র উত্তমরূপে নিজে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, এ কথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে।

যদি এই সকল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়া-সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না! যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ তাহার সেবা কে-না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনপূর্ব্বক তাহার অসদংশের বর্জন করিয়া সদংশ, যাহা এ দেশের অনুকূল, এবং যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে তাহাকেই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এ দেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত ক্রমেই তৎ তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই—তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া যেন স্খলিত না হই, অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই একটা গুণ আছে যে এখানে ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না—এ পর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ ; কবি-গুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুল-রবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক ;—আর সর্ব্বোপরি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌত-সঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর—তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গ-সাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা অনাচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক—আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা-না-একটা স্থির লক্ষ্য ছিল ; এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে—অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থির

দৃষ্টি আছে বলিয়াই অন্য কোন বাধা-বিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি-উপাসকগণ অম্লান বদনে ইরান ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন—পিউরিটানেরা[৮] মাতৃভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমেরিকার গহন বনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক; অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের, বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র-ভেদ[৯] করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজ-নীতি, আচার, ব্যবহার সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্যকানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের[১০] ন্যায় তুমি ভক্তির ভান করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, তবেই দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এই ভাবে অন্যের সুচারু ও সম্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতিপূর্ব্বে অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না। আমাদের সহিত তুলনা করিলে রোমের

প্রাচীন সম্পদ্ গণনার মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয়দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তা-গঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না—পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য—গ্রীসের কলাবিদ্যা—গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা-গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তা বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায় প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে-সমুদয় জরাজনিত পলিতভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক অবনত হইল।

কিন্তু এই গ্রীস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই রোমীয়গণ দু'হাতে যতটা পারিয়াছে গ্রীসের দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে—তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আমাদের প্রাচীন

সম্পদ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ আমাদের যাহা নাই—অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা-বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ-সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শও করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক-স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জম্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহার পূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদেরর জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্ এই দুই-ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে—বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি—আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু—প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা, দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি—কদাচ যেন জাতীয়তা বিসর্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ সকল বস্তুর কোনক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে তাহা ত আছেই, কেই তাহা অপহরণ করিতেছে না; সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জম্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃ পরতঃ করিতে হইবে—শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম—এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোন

লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে—আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সংকীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্ম-ভাব বর্জ্জিত, তাহা উরগ-ক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর—যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব-পুষ্প চয়ন করিব এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলংকৃতা করিব -মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

যে বায়ু মধুকণা বহন করে না তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে—সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিণী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যাতা লাভ করিতে পারিব।

আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণ-প্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন—তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হইক, অন্যের অনুদ্বেজক হউক ; যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় অবাধিত গতিতে উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়

"মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োহস্তু তে ॥"[১১]

উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর রচনা। এঁকে বাংলাভাষায় টপ্পা-সংগীতের 'প্রবর্তক' বলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, নিধুবাবুই এ-দেশের প্রথম ইংরেজি-জানা বাঙালি-কবি। এবং তিনিই প্রথম স্বাদেশিক সংগীতের রচয়িতা। হুগলি জেলার চাপতা গ্রামে এঁর জন্ম। আলোচ্য পংক্তি কয়টি হল:

"নানা দেশের নানান্ ভাষা; / বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? / কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর? / ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?" (দ্র. মোহিতলাল মজুমদারের 'কাব্য-মঞ্জুষা'য় সংকলিত ১১ সংখ্যক কবিতা, ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১৫)।

২ অক্ষয়কুমার: চিন্তাশীল অক্ষয় কুমার দত্তের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন স্যার আশুতোষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আলোকে যে সকল মনীষী বাংলা গদ্য-সাহিত্যে স্বীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, অক্ষয় কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জন্ম নবদ্বীপের কাছে চুপী গ্রামে ১৮২০ ইংগাব্দের ১৫ জুলাই। পিতা পীতাম্বর, মাতা দয়াময়ী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'অনঙ্গমোহন' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রথম সারির লেখক ছিলেন। গুপ্ত-কবির ইচ্ছানুসারেই বিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগ দেন অক্ষয়কুমার। ক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'য় ৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি মাতৃভাষায় বর্ণমালা, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। অক্ষয়কুমার রচিত 'চারুপাঠ' সে যুগে যুগান্তর এনেছিল। এছাড়া, তাঁর 'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা', 'ধর্ম্মনীতি', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বস্তুত, বাংলা গদ্য সাহিত্যের পংক্তিতে বিদ্যাসাগরের পরেই অক্ষয় কুমারকে বসানো হয়। (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয় কুমারের পৌত্র)। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৮৮৬ ইংগাব্দের ২৮ মে অক্ষয় কুমার পরলোকগমন করেন। ইনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন।

২(ক). তুলনীয় 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি: "যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। …কিন্তু বাঙ্গালার

ইতিহাস নাই।······ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম।······বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।"

৩. বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধের শিরোনামও ছিল 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'। বঙ্কিমের আলোচনা-অনুসারে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হল এই রকম: কোলবংশীয় অনার্য → দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য→আর্য→ বাঙালি।

৪. আলোচ্য অভিভাষণটি স্যার আশুতোষ প্রদান করেছিলেন ১৯১৬ ইংগাব্দে। সে সময় বঙ্গবাসীর সংখ্যা কখনোই সাত কোটি ছিল না। কারণ ১৯৩১ ইংগাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী বঙ্গবাসীর সংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮ (দ্র. জাতীয় সাহিত্য / ১৯৪৯ ইংগাব্দ সংস্করণ, পৃ ৯১)। ১৯২১ ইংগাব্দের লোক গণনায় বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৪,৭৫,৯২,৪৬২। (দ্র. মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৮)। স্যার আশুতোষ 'সাত কোটি বঙ্গবাসী' পদটিকে কথার কথা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন সম্ভবত। অবশ্য ১৮৭৬ ইংগাব্দে রচিত 'বন্দেমাতরম্'-এর একটি পংক্তি হল: সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ······'।

৫. দ্র. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কর্মযোগ ৩য় অধ্যায়, ২১ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পংক্তি। 'কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ তাকেই অনুসরণ করে।'

৬. 'উত্তররামচরিতম্'-এর শ্লোক। 'গুণ আদরণীয়, গুণী স্ত্রী কি পুরুষ, বয়স কত, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।" সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ: "শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা / বিশুদ্ধেরুৎ কর্ষস্তুয়ি তু মম ভক্তিং দৃঢ়য়তি। / শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতা। গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ॥"

৭. চতুর্মুখ ব্রহ্মা: সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে যে অপরূপ সুন্দরী তিলোত্তমাকে নির্মাণ করিয়েছিলেন, সেই তিলোত্তমা বিদায়কালে যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করছিলেন, সেই সময় তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মাথা বের হয়। ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। ব্রহ্মা সকলের সৃষ্টিকর্তা রূপে চিহ্নিত।

ব্রহ্মার কন্যা দেবসেনা, সন্ধ্যা, শতরূপা এবং বাক্। স্ত্রী সাবিত্রী, গায়ত্রী এবং সরস্বতী। নানা পুরাণে ব্রহ্মাকে নিয়ে নানা কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।

৮. অভিধানে আছে Paritan = A Person who adheres to strict moral or religious principles, esp. one opposed to luxury and sensual enjoyment.

৯. দ্র. 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ২২(খ) সংখ্যক টীকা।

১০. **প্রহ্লাদ :** দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। মাতা রাণী কয়াধু। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্কের হাতে প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ ক্রমশ ধার্মিক ও বিষ্ণুভক্ত হয়ে ওঠে। অথচ বিষ্ণুর হাতে ভাই হিরণ্যাক্ষ নিহত হওয়ার দরুন হিরণ্যকশিপু আমরণ বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। পুত্র পিতার অনুগামী না হওয়ায় হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সর্ব উপায়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু প্রহ্লাদের তিলমাত্র অনিষ্ট হয় না। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান সর্বত্র—ভক্তের এই বাক্য প্রমাণ করতে স্ফটিক স্তম্ভ হতে নৃসিংহ মূর্তিতে বিষ্ণু আত্মপ্রকাশ করে হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। পরে প্রহ্লাদকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হয়ে যান। বিষ্ণু-স্পর্শে প্রহ্লাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পাতালে দৈত্যদের রাজা হন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধককে রাজ্য সমর্পণ করে বদরিকাশ্রমে কুটির বেঁধে বিষ্ণুর আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রহ্লাদের অপর ভাইয়েরা যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাষ্কল। (দ্র. 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' অভিভাষণের ২২(ক) সংখ্যক টীকা)।

১১ তোমার চিত্ত হতে মধু ক্ষরিত হোক, তোমার মুখ হতে মধু ক্ষরিত হোক। তোমার শীল বা আচরণ হতে মধু ক্ষরিত হোক, তোমার জগৎ মধুময় হোক।

বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ

"সাজাইতে মাতৃভাষা সদা যার মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি জননীর মুছাতে নয়ন-নীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী'পরে অমর-সমান॥"[১]

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল।[১(ক)] বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া মাতৃভাষার চরণকমলের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ এই সম্মিলনের তিন দিন আপন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ—সমস্ত বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমান কালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেন-না, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না! যাহাতে বঙ্গবাসি-জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরম্ভ করিতে হইবে।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন,—এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে? এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশ শত বৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয়-সাহিত্য-গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায়-উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে—ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী জাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিক বারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব,—একা আমি নহি, আর দশজনেও যাহাতে আমার মাকে মা বলিতে পারিলে নিজেকে ধন্য, কৃতার্থম্মন্য মনে করিবে, এমন ভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে—এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কালে তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতি-প্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ এই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে স্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক[২] বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলীপুত্রের[৩] পুরা-চিহ্নসমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্‌গ্রীব,—

ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতিপত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন, বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথগণের স্পৃহণীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্ঘ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে—বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে—আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি,—ইহা আমি যতটা জানি এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মাদের কোন কাজে, কোন উপকারে আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে চরিতার্থ হই। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্যসাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন-যজ্ঞের ঋত্বিগ্‌রূপে মনোনীত করায় উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি

নাই। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে! কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা! কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না! আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভূত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। একদিকে, দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গভাষারও আলোচনা করিতেছেন ; আর দু'দিন পরে যাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে! শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে! আর ঐ দেখ, অন্যদিকে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সাম্মলনের[৪] অভিভাষণে আমি জাতীয় সাহিত্যগঠন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম,

"দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নিৰ্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে,

সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেববাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।"

সুতরাং জাতীয় সাহিত্য-গঠন-সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয়-সাহিত্য-গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে ; এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে! যদি এমন ভাবে বঙ্গ-সাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় আবিষ্কৃত এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্যশিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয়সমূহ এযাবৎকাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।

যদি এমন ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও শিখিতে হয় এবং না শিখিলে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ও অন্য শত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পূরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চির-স্থায়িনী হইবে : বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট্ সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক আমার জননী বঙ্গভাষাকে অনন্ত-

কালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে।

বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক। এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি,—একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য। রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতালাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজরা যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে—যেমন ইংরাজী ভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এমন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয়ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাষিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয় বৈজয়ন্তী সংস্কৃত ভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীক ভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্ আজীবন-ছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে, সেই সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না।

মনে করুন, গণিত এবং রসায়নশাস্ত্র। রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং রাসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই সেই শাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান ঐ ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাতে চান, তবে তাঁহাকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে, অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন,

জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্সপীয়ারের[৫] অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাষিয়ান এবং ইংরাজী ভাষার এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, সেই সেই ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন-বিষয়ে রাষিয়ান ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্সপীয়ার, মিলটন, বাইরন[৫(ক)] প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের[৫(খ)] অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজী ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশসমূহেও এই এই ভাষার এত ভাষার এত গৌরব কি কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃত ভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন পশ্চিমে প্রত্যেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন না কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি[৬] তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখুন, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষের বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংকৃত ভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষকে উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই; ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসাস্বাদের আশায় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এ দেশীয় শকুন্তলা নাটকের বিদেশীয়-কৃত অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্ম-হারা হইয়াছিলেন।[৭] জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথা-গোরাস, এরিস্‌টটল[৮] প্রভৃতির মনীষা সাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ-পূর্ব্বক গ্রীক ভাষা এই মরধামে অমরতালাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধি-পত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিৎকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে, ঐ ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্রসূর্য্য পরিবর্ত্তিত

হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে-সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তা-রত্নবিমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে—জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ-দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে—ঐ সকল মনীষা মন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না।

নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও, সেই প্রাচীনকাল হইতে বেদাদি-রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃত ভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা[৯] প্রভৃতি উপনিবন্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস[৯ক] প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময় হারে সংস্কৃত ভাষা অলংকৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃত ভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল—সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না-কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবন্ধ করেন এবং উত্তর-কালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রবীণতা লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গ-

ভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাষিয়ান, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দু'দশ বৎসরে সম্ভব নহে, বা আরম্ভমাত্রেই ফললাভের আশা নাই। কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ কামনীয় নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যসম্ভার, নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর বিজয়-প্রশস্তি ঘোষণা করিবে।

এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মার সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক ব্রতী হইলে নিশ্চয়ই মনোমত বর লাভ করিতে পারিব। কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই, তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতে লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া দেশের ধন বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব —বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের

সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। উষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোকচ্ছটায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে —ভাস্বর হইবে।

এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, ক্বচিৎ নদীমাতৃক—আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়—চিরকাল হইয়াও আসিতেছে। কোথাও-বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়,—কিন্তু সুফললাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণনগরের ভারতচন্দ্র, খানাকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লী-বিটপীর সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, মেঘনাদের মধুসূদন[১০] এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন[১১] যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও—এই ঘোর বিপর্য্যয়ের মধ্যেও—যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের[১১(ক)] ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মহাশ্বমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না—হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্ট-বাদী, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের[১১(খ)] উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস-গোবিন্দ-দাসের বঙ্গে, রামবসু[১১(গ)] নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা,—প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না—প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই কেবল উদ্‌যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এই ত সামান্য উদ্‌যোগেই ভীরু বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন

তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মাল-মস্‌লা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জনকয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সংকল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতিবিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এ অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন,—কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তাপ্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে; তাই আপাততঃ ঈষৎ অপ্রিয় হইলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়ভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যকভাবে পেঁৗছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর, এরূপ অপরিপক্ক বয়সে তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম-উদ্‌যোগ পণ্ড, ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চিরতুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গে যাহারা পেঁৗছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না।

আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী, মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ-

নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহুকোটি বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে তবে ঐ সংকল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তি-প্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির-গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন লইয়া আসুন—মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃ-মন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব-নিকাশ করিব না; এখন হিসাব-নিকাশের সময়ও নহে; করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব,—কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা-বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোন প্রকার অসংযমের আধিক্য হইলে এই সংকল্পিত স্বর্ণ সৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতি-বৃন্দ!—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একই লক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন; সমস্ত ভুলিয়া আপনা ভুলিয়া একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্য-চক্র-ভেদ করিতে পারি-বেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করি-বেন। ধনিনির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন বান আসে তখন অনেক আবর্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে সত্য, কিন্তু সেই আবর্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটিতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য, কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ

দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সৎ, যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, অন্য সমস্ত কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য-কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই।

দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃষ্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল,—সেই 'সাতভাই চম্পা', সেই 'পক্ষিরাজ ঘোড়া', সেই 'শিবঠাকুরের বিয়ে' প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়নরঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায়[১২] যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন-সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্তার উপলব্ধি না করে, ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জন এবং কতটুকুই বা বর্জন করিতে হইবে—এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এত দিনে বঙ্গসন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল জাতীয় সাহিত্যনির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া হাল ধরিয়া বসিতে হইবে—যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সে পক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমাদের তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে।

যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে—আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে

বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই—এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন আলেখ্যের প্রচ্ছন্ন ভূমি বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে যেমন মূলচিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্ব স্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে যতদিন শিক্ষিতগণ টানিয়া আনিতে না পারিবেন, ততদিন বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ; এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, যতদিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অনেক অগ্নি-পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ লাভ করা, হৃদয়ের মার্জনা করা, দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব-গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি মানুষ একবার তৈরি হইয়া উঠে—ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন্ ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক

বুঝিতে বা ধরিতে না পারি যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি একবার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই দিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই যে, সে গতি রোধ করিতে পারে। বাঙ্গালী জাতির ইতর-ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের এবং আমার জাতির অভ্যুদয় গ্রথিত,—বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর-ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, এক মনে সকলে মধুর বাসন্তী মূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে এক ভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির বিমল প্রভায় বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাংলার মাটি, বাংলার জলে"[১৩] পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামলা কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্য নবীন নীল নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শ গ্রন্থ,—সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী,—রাম, যুধিষ্ঠির, শিবি, দধীচি, ভীষ্ম,

অর্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক,—ভরত,[১৪] লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা—তাহাদের আবার অভাব কিসের ? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্র-শালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্র-পুষ্প-পল্লবে বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণ-পাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে।

বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণ, সদ্ভাবচন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া তোমাদের সাহিত্য-মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটি বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে 'মা' বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌঁছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদবিসংবাদ, স্বার্থ চিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রত-দীক্ষিতের মত সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদপূজায় প্রবৃত্ত হও ; একবার মাতৃপ্রেমে জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে 'মা' বলিয়া ডাক দাও ; বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল,—

"তোমারি তরে, মা ! সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে, মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"[১৫]

দেখিবে, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে,—বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লয়ে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে,—চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই,—কল্পনার অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীম শক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই

পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এত দিনে অন্য প্রকার হইতে। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ; এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য যাহা সংগত মনে হইবে, তাহাই অসংকোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর, সিদ্ধি হইবে ; কালে অমর হইতে পারিবে—বাংগালী জাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরেণ্য, কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ-প্রতিম স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুংকার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"[১৬]

আর সেই সংগে বলিও—হে বংগের জাতীয় সাহিত্য-মন্দিরের ভবিষ্য স্থপতি-বৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।"[১৭]

উল্লেখপঞ্জী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'সাহিত্য পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মর্ত্ত্যের দেবতা' নামক কবিতার কয়েকটি পংক্তি। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ : ২৩ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১(ক). বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০৭ ইঙ্গাব্দের ৩-৪ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়িতে (১৭-১৮ কার্তিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। সভাপতি নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ। (দ্র. রবিজীবনী / প্রশান্ত কুমার পাল, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৮৪-৮৫)।

২ ধর্মাশোক : মগধের মৌর্যবংশের তৃতীয় সম্রাট। প্রিয়দর্শী নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। পিতা বিন্দুসার। পিতার মৃত্যুর পূর্বে অশোক তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। বিন্দুসার শতপুত্রের জনক ছিলেন ; ফলে, তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়। মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সাহায্যে অশোক ভাইদের পরাজিত ও নিহত করে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বছর পর এই অভিষেক হয়। অশোকের নামে প্রাপ্ত চল্লিশটি শিলালিপি থেকে অনুমান করা হয় যে, তিনি খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ সময়ে রাজত্ব করতেন। অশোকের রাজত্ব উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ হতে সম্ভবত বাংলার কিছুটা ও হিমালয়ের পাদদেশ হতে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ এর আওতাভুক্ত ছিল না। রাজা হওয়ার ৮ বছর পর অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। জনশ্রুতি, কলিঙ্গ-যুদ্ধে ১ লক্ষ নিহত, দেড় লক্ষ দেশচ্যুত এবং লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীভুক্ত হয়। যুদ্ধের এই পরিণাম দেখে গভীর অনুশোচনায় অশোক উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে দীক্ষা নেন। কলিঙ্গ জয়ের পর দীর্ঘ ৩০ বছর অশোক রাজত্ব করেছিলেন ; কিন্তু একদিনের জন্যও আর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ধর্ম-বিজয়ের জন্য নির্দেশ দিয়ে যান। এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য ইতিহাসে অশোক 'ধর্মাশোক' পরিচিতি লাভ করেন। জীবদ্দশায় অশোক সারা দেশে ৮৪ হাজার বৌদ্ধ-স্তূপ স্থাপন করেন। তাঁর স্থাপিত সারনাথস্তম্ভের শীর্ষদেশ আজকের ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতীক। অশোকের পঞ্চ মহিষী হলেন যথাক্রমে অসন্ধিমিত্রা, কারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতী ও তিষ্যরক্ষিতা। পুত্র তিবর, কুণাল ও জলৌক। অশোকের 'মহেন্দ্র' নামে পুত্র এবং 'সংঘমিত্রা' নামে কন্যার কথা বলা হলেও শিলালিপিতে এদের পরিচিতি অনুপস্থিত।

৩. পাটলিপুত্র : বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মগধরাজ অজাতশত্রু খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে অবস্থিত পাটলিগ্রামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করেন। বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন পাটলিগ্রাম একটি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হবে। অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়বর্ধন মগধের রাজধানী পাটলিগ্রামে নিয়ে আসেন, নাম হয় পাটলিপুত্র। প্রায় হাজার বছর এখানে মগধের রাজধানী ছিল। পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস,

ফা-হিয়েন, আলবেরুনির ভারত-বিবরণে পাটলিপুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। আর্যভট্ট এখানেই জন্মেছিলেন ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। স্বনামধন্য কাত্যায়ন ও চাণক্য এখানেই বাস করতেন। নানা সময়ে খননের ফলে পাটলিপুত্রের বহু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

৪. ১৩২২ বঙ্গাব্দে স্যার আশুতোষ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ দিয়েছিলেন।

৫. **সেক্‌স্‌পীয়র:** পুরো নাম উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়র। ইংরেজ কবি-নাট্যকার। জন্ম ইংলণ্ডের স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন-অ্যাভন্‌-এ সম্ভবত ২৩ এপ্রিল ১৫৬৪ ইংগাব্দ। পিতা জন, মাতা মেরী আর্ডন। উইলিয়ম পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। স্ত্রী অ্যান হ্যাথাওয়ে; তিনটি সন্তান যথাক্রমে সুজানা, হ্যামনেট, জুডিথ। অভিনয়-নৈপুণ্য, রচনা-লালিত্য, নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের জন্য উইলিয়ম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত হন। মোট ৩৭টি নাটক লিখেছেন; এর মধ্যে ১৬টি কমেডি, ১১টি ট্র্যাজেডি এবং ১০টি ঐতিহাসিক। রোমিও এণ্ড জুলিয়েট, ক্লিওপেট্রা, দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস প্রভৃতি আজও সমান জনপ্রিয়। মৃত্যু তারিখও সম্ভবত ২৩ এপ্রিল ১৬১৬ ইংগাব্দ।

৫(ক). **মিলটন:** জন মিলটন। জন্ম ১৬০৮ এবং মৃত্যু ১৬৭৪ ইংগাব্দে। ইংরেজ কবি, পিউরিটান ও রাজতন্ত্রবিরোধী। কেম্ব্রিজে পড়াশুনা। ১৬৬৭ ইংগাব্দে অন্ধ অবস্থায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের বিদ্রোহ এবং আদম ও ঈভের পতনের কাহিনী নিয়ে ১২ সর্গে রচনা করেছিলেন প্রসিদ্ধ 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্য। ১৬৭১-এ 'প্যারাডাইজ রিগেইন্‌ড্‌' রচিত হয়।

বায়রন: জর্জ গর্ডন বায়রন। জন্ম ১৭৮৮ এবং মৃত্যু ১৮২৪ ইংগাব্দ। ইংরেজ কবি ও স্বাধীনতার ঋত্বিক। জন্মখঞ্জ। ১৮১৬-তে ইংলণ্ড ত্যাগ করে ইতালিতে বসবাস। তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের মুক্তি সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ মদত দেন। ১৮০৭-এ প্রথম গ্রন্থ Hours of Idleness; ১৮০৯-এ English Bards and Scotch Reviewers; অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ Childe Harold's Pilgrimage. নাটকের মধ্যে Manfred এবং The Two Foscari উল্লেখযোগ্য। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে সমসাময়িক অভিজাত সমাজের ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও কপটতাকে জর্জরিত করেছিলেন বায়রন।

৫(খ). **নিউটন:** অ্যাইজ্যাক নিউটন। ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী

তথা গণিত বিশারদ। ১৬৪২ ইংগাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ইংলণ্ডের উল্‌স্‌থর্প গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম। গণিতশাস্ত্রে নিউটনের উল্লেখযোগ্য কাজ হল বাইনোমিয়াল থিয়োরেম, ডিফারেন্‌শিয়াল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস এবং ক্যালকুলাস তত্ত্বের প্রধানসূত্র আবিষ্কার। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কার বলবিদ্যা, মহাকর্ষতত্ত্ব ও আলোকতত্ত্ব। নিউটনের বলবিদ্যাকে সমগ্র বিজ্ঞানের ভিত্তি বলা চলে। প্রায় ২০০ বছর তাঁর বলবিদ্যা ও মহাকর্ষতত্ত্ব নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর এই গবেষণা বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' এবং 'অপ্‌টিক্‌স' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

৬. রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলা হয়েছে। মূল শ্লোকের জন্য দ্রষ্টব্য 'কৃত্তিবাস' অভিভাষণের ৩৪ সংখ্যক টীকা।

৭. কালিদাসস্য সর্বস্বং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন উইলিয়ম জোন্স। সেই অনুবাদের জোহান্‌ জর্জ অ্যাডাম ফর্স্টার-কৃত জার্মান তর্জমা পড়ে মহাকবি গ্যায়্‌টে ১৭৯১ ইংগাব্দে বলেছিলেন : "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফললাভের অভিলাষ করে. যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি, এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" (বিদ্যাসাগরের বঙ্গানুবাদ)।

৮. প্লেটো : বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খ্রীস্টপূর্ব ৪২৯ অব্দে জন্ম এবং ৩৪৭ অব্দে মৃত্যু। আসল নাম অ্যারিস্টোকেল্‌স্‌। আথেন্স নগরীতে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য এবং অপর দার্শনিক অ্যারিস্টোটল-এর শিক্ষক। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ Dialogues এবং Republic.

ইউক্লিড : খ্রীস্টপূর্ব ৩য় শতকের প্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতবিদ্‌। ইউক্লিডের (Euclid) উদ্ভাবিত Elements of Geometry হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যের মতোই অমরত্বলাভ করেছে।

পিথাগোরাস : সুমহান গ্রীক দার্শনিক। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮২ অব্দে জন্ম এবং মৃত্যু ৫০০ অব্দে। মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ক মতবাদের স্রষ্টা পিথাগোরাস (Pythagoras)। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তত্ত্ব কোপারনিকাসের আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয়।

এরিস্টোটল : গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হলেন এরিস্টোটল (Aristotle)। খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে জন্ম এবং মৃত্যু ৩২২ অব্দে । গুরু প্লেটোর মৃত্যুর পর আথেন্স নগরী ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। আরো পরবর্তীকালে তিনি আথেন্সে স্থাপন করেন Lyceum (বক্তৃতা-কক্ষ) এবং Paripatetic school of philosophy (ভাববিনিময় কেন্দ্র) যা মানুষের চিন্তার প্রসারতায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

৯। **বেদ :** এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞান। সায়নাচার্যের মতে, বেদ হতে ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহার সম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা যায় ; প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যা জানা সম্ভব নয়, বেদ দ্বারা সেই উপায় লাভ হয়। বেদকে শ্রুতি বলা হয়েছে। ঋষিরা বেদের রচয়িতা নন—দ্রষ্টা। বেদ অপৌরুষেয়, আচার্য-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বেদ শ্রুত হয়ে এসেছে। ঋক্, যজুঃ, সাম— পদ্য, গদ্য ও গীতি, এই তিনপ্রকার মন্ত্র 'ত্রয়ী বিদ্যা' নামে অভিহিত। অথর্ব বেদ অন্য তিনটি বেদের পরে রচিত হয়েছিল ; তাই এর স্থান অন্যান্য বেদের নিচে। বেদের চার ভাগ : (১) সংহিতা বা মন্ত্রাংশ, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক এবং (৪) উপনিষদ্।

উপনিষদ্ : বেদের অন্তিম অংশ। বেদের চারভাগের একভাগ 'আরণ্যক'। উপনিষদ্ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। উপনিষদের অর্থব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে, উপনিষদ্ 'বেদান্ত' নামে অভিহিত। কেউ বলেছেন, গুরুর পদপ্রান্তে বসে জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী যে-ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করেন, তাই উপনিষদ্। আবার কেউ বা বলেছেন, দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান গুরু নির্বিচারে দান করেন না ; প্রকৃত অধিকারী মনে করলে প্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গোপনে এই জ্ঞান সমর্পণ করতেন। তাই উপনিষদের অপর নাম 'রহস্য'। প্রতিটি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেকে প্রায় ২৮০ বলে মনে করেন।

সংহিতা : বেদের মন্ত্রাংশ হল সংহিতা। যজ্ঞ প্রভৃতিতে প্রযোজ্য মন্ত্রগুলির সংগ্রহ হল সংহিতা। সংহিতাই বেদের সর্বপ্রধান ভাগ। হোতা ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা দেবতার আহ্বান করতেন। উদ্গাতা সামগান দ্বারা আহূত দেবতার স্তুতি করতেন। অধ্বর্যু যজুর্মন্ত্র পাঠ করে অগ্নিতে 'হব্য' আহুতি দিতেন।

৯(ক). ভাস : প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার। ১৯১২ ইংগাব্দে ভাস-বিরচিত তেরোখানি নাটক যিনি সম্পাদনাসাপেক্ষে প্রকাশ করেছিলেন, সেই মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ভাসকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তীকালের লোক বলে নির্ণয় করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গ ভাসকে খ্রীস্টীয় ৩য় শতকের বলে অভিমত দিয়েছেন। ভাস-রচিত নাটক-গুলি হল : স্বপ্নবাসব-দত্তা, চারুদত্ত, অবিমারক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, প্রতিমা, অভিষেক, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতকাব্য, বালচরিত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি। (দ্র. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস / গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১০৭-১৫, আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ)।

১০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-কে ঘিরেই প্রসিদ্ধ হন। / টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামের আড়ালে প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত ব্যঙ্গকাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল'। / দীনবন্ধু মিত্রকে 'নীলদর্পণ' নাটক এবং মাইকেল মধুসূদনকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভূত খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

১১. কালীপ্রসন্ন : কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০ ইঙ্গাব্দ)। সাহিত্য-সেবী, সমাজ-সংস্কারক, গুণগ্রাহী, দানবীর। জোড়াসাঁকো নিবাসী দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, নন্দলাল সিংহের পুত্র। হিন্দু কলেজে পাঠ নিলেও প্রকৃত শিক্ষালাভ গৃহে ইংরেজ শিক্ষক ও সংস্কৃত পন্ডিতের অধীনে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্বগৃহে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন করেন। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হলে এই সভা-ই কবিকে সর্বাগ্রে সংবর্ধনা জানায়। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রচারের জন্য রেভারেন্ড লং-এর ১ হাজার টাকা জরিমানা হওয়ায় সেই টাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কালীপ্রসন্ন আদালতে জমা দিয়ে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বহুবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' ও 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' কালীপ্রসন্নর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এছাড়া, প্রসিদ্ধ পন্ডিতদের দিয়ে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়ে নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন, যা এযুগে 'কালী সিংহের মহাভারত' নামে খ্যাত।

১১(ক). পৃথ্বীরাজ কাব্য : যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণের একটি কাব্যের নাম। ১৯১৬ ইঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

১১(খ). মেকলে : মার্কাস টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। পিতা জ্যাকারি। ১৮৩৪ ইঙ্গাব্দে ভারতে আসেন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য। এদেশের ফৌজদারী আইনের সংস্কার করান। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রার্থী নির্বাচনে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে আন্তরিক ভূমিকা নেন।

১১(গ). রাম বসু : রামমোহন বসু (১৭৮৬-১৮২৮ ইঙ্গাব্দ)। পিতা রামলোচন। হাওড়ার শালিখায় জন্ম। কবির দলে গান বেঁধে দেওয়ার জন্য বিখ্যাত হন।

১২. বটতলা : এর যথার্থ অবস্থান আজো আবিষ্কৃত হয়নি। আজ হতে ২০০ বছরের অধিক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতীক ছিল 'বাঁধা বটলায় ছড়ানো বটগাছ'। মুদ্রণ ও প্রকাশনার বটতলা ততো প্রাচীন নয়। বেশি হলে শ'দেড়েক বছরের প্রাচীন। তৎকালীন সকল পুস্তক-প্রকাশকদের ঠিকানাই ছিল 'বান্ধা'। ১৮৭০ বঙ্গাব্দের পরে 'বটতলা' নামটা প্রকাশকদের ঠিকানা হতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। এই বটতলার ভৌগোলিক সীমানা ছিল উত্তরে গরানহাটার চৌরাস্তা এবং দক্ষিণে সভাবাজার। আনুমানিক ১৮১৬ ইংগাব্দে বিশ্বম্ভর দেবের প্রেস প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৮৭০ ইংগাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি বটতলা প্রকাশনার যুগ।

১৩. রবীন্দ্রনাথের 'রাখীসংগীত'-এর প্রথম পংক্তির খন্ডাংশ। ১১ আশ্বিন ১৩১২ বংগাব্দ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ ইংগাব্দ) বিকেল ৬-টায় কলকাতার ১৮/৪ অক্রূর দত্ত লেন-এ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাবিত্রী লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশন বসে। অধিবেশনে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ ইংগাব্দে কার্জনের 'বংগভংগ' প্রস্তাব কার্যকর হলে অখন্ড বাংলার ঘরে ঘরে রাখীবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উপলক্ষে কবি বিখ্যাত 'রাখীসংগীত' (বাংলার মাটি বাংলার জল) রচনা করেন। (দ্র. রবিজীবনী / প্রশান্ত কুমার পাল, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৬১, ১ বৈশাখ ১৩৯৭ বংগাব্দ সংস্করণ)।

১৪. ভরত : দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ; কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে আবির্ভূত। শৈশব হতেই ভরত সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, প্রতাপশালী এবং বিনীত। দশরথ কৈকেয়ীকে বলেছেন : 'রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।' (২।১২।৬১)। 'আমি ভরতকে রামের চেয়েও অধিকতর ধার্মিক বলে মনে করি।' শ্রীরামচন্দ্রও ভরত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন : 'জানামি ভরতং

ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্। / সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি॥' (২।১১।৩০)। এহেন ভরতের ভাগ্য মাতৃদোষে যে বিধিবিড়ম্বনা ঘটেছিল, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জননী কৈকেয়ীকে বিন্দুমাত্র ভর্ৎসনা করতে ছাড়েননি তিনি : 'ত্বৎকৃতে যে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।/ অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিত॥' (২।৭৪।৬)। 'সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্। / রজ্জুং বধাথবা কণ্ঠে নহি তেহন্যৎ পরায়ণম্॥' (২।৭৪।৩৩)। 'তোমার জন্যই আমার পিতা পরলোকে এবং রাম অরণ্যে গমন করেছেন। তোমার জন্যই জগতের সকলের কাছে আমি কলঙ্কিত হলাম।' 'পাপীয়সি, তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর, কিংবা স্বয়ং দণ্ডকারণ্যে গমন কর, অথবা গলায় রজ্জু বেঁধে প্রাণ ত্যাগ কর। তোমার অন্য গতি নেই।' যে-সিংহাসনে রামের অভিষেক হত, সেখানে ভরত কখনো বসেননি। রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজ্যশাসন করেছেন। আবার, কালের ব্যবধানে রামের গচ্ছিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করে নিজের জন্মকে সার্থক মনে করেছেন। ভরতের মতো 'অবধায়ক' সর্বকালেই বিরল।

১৫. আলোচ্য গানটিকে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র কোন্ যুক্তিতে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান' বলে উল্লেখ করেছেন বোঝা গেল না। (দ্র. জাতীয় সাহিত্য, 'সংক্ষিপ্ত বিবৃতি' অধ্যায়, ৬৯ সংখ্যক টীকা)। অপরপক্ষে, আমরা জানি, ১৬ বছর বয়সে গানটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিদেব ঘোষের মতে, গানটি কবি সঞ্জীবনী সভার জন্য রচনা করেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্র-সঙ্গীত, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ সংকরণ, পৃ. ৩১)। প্রশান্তকুমার পাল সঞ্জীবনী সভার প্রতিষ্ঠা-কাল সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, এই সভা বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দের (এপ্রিল ১৮৭৬ ইঙ্গাব্দ) পূর্বে স্থাপিত হয়নি। (দ্র. রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, ১ বৈশাখ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, পৃ. ৩০১)। তাঁর উক্ত গ্রন্থ হতে আরো জানা যায় যে, 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ব্রজনাথ দে, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ এই সভার 'সভ্য' ছিলেন। 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্'—এই বেদ-মন্ত্রের গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত গুপ্তভাষায় এই সভার নাম ছিল 'হামচূপামুহাফ্'। (পৃ. ৩০৩)। সঞ্জীবনী সভার আয়ুষ্কাল মোটামুটি ছ'মাস—পৌষ ১২৮৩ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। (পৃ. ৩০৫)। 'সঞ্জীবনী সভা' অস্তমিত হওয়ার দু-মাসের

মাথায় শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার জন্ম হয়। 'ভারতী'র আশ্বিন ১২৮৪ (১৮৭৬ ইংগাব্দ) সংখ্যার ১৪৪ পৃষ্ঠায় 'উৎসর্গ'-গীতি' শিরোনামে আলোচ্য গানটি প্রকাশিত হয়। প্রশান্তকুমার পাল-ও 'রবিজীবনী' / ১ম খণ্ডের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় এই তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু একই গ্রন্থের ৩০৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন : ''ভারতীর উক্ত সংখ্যাতেই (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ) 'উৎসর্গ'-গীতি' শিরোনামে 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ'—রবীন্দ্রনাথের লেখা এই গানটি প্রকাশিত হয়েছে।'' আলোচ্য 'উৎসর্গ'-গীতি'টি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি-সংকলিত 'জাতীয় সংগীত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (আগস্ট ১৮৭৮ ইংগাব্দ) সংকলিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিচিত্রা' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের ৭ম পরিচ্ছেদেও ঈষৎ পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (রবিজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭)।

১৬. কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারত-সংগীত' নামক দীর্ঘ কবিতার ৩য় স্তবক। 'ভারত-সংগীত' হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' গ্রন্থের ১ম সংস্করণের (২১ নভেম্বর ১৮৭০ ইংগাব্দ) অন্তর্ভুক্ত। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র ২য় সংস্করণে জাতীয়তাবোধক 'ভারত সংগীত' কবিতা বর্জিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এর ৭ শ্রাবণ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭। 'ভাবত-সংগীত'-এর ২৭ তম স্তবক।



পরিশিষ্ট

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : রচনাপঞ্জি

[মাত্র ৬০ বছর জীবিত ছিলেন স্যার আশুতোষ (জ. ২৮ জুন মঙ্গলবার ১৮৬৪—মৃ. ২৫ মে শনিবার ১৯২৪ ইঙ্গাব্দ)। এই স্বল্প সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কারে এবং আদালতী পেশায়। গৌণরূপে হলেও কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সেই সূবাদে রাজ-মন্ত্রিসভায় 'সদস্য' হিসেবে থাকতে হয়েছে তাঁকে। সর্বত্রই তিনি নিরলস কর্মী। প্রায় অবসরহীন এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গুটিকয়েক গ্রন্থ, পুস্তিকা তথা নিবন্ধ তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। এর অধিকাংশই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণের সংকলন, জটিল গণিত-সমস্যার সমাধানমূলক নিবন্ধ এবং দু-একটি প্রণালীবদ্ধ গণিত-গ্রন্থ। অধুনা প্রায়-দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থ, পুস্তিকা তথা নিবন্ধের তালিকা প্রণয়নও একরকম 'অসাধ্য' পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, নৃবিদ্যা, আইন এবং শিল্প-কলা—এই এগারোটি বিষয়ে স্যার আশুতোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ৮৬ হাজার গ্রন্থ নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের বহুশ্রুত 'আশুতোষ সংগ্রহ' নামে স্বতন্ত্র বিভাগটি গড়ে উঠেছে। এই বিভাগে স্যার আশুতোষের যাবতীয় রচনা সংগৃহীত থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবিক তা নেই। উপরন্তু, জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল ভবনের ক্যাটালগে স্যার আশুতোষের নামে এমন কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে যা আদৌ স্যার আশুতোষের রচনা নয়। যথা—ক) 'Vakil : an examination of the principles and policy of the Bengal Tenancy Bill'; (খ) 'Commentaries on the Law of Specific Relief in British India' (ক্যাটালগ নং 171. A. 727)।

বস্তুত, উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টির একটি প্রথম 'পি আর এস'-প্রাপক আশুতোষের রচনা। বলা বাহুল্য, এই আশুতোষ যে-বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বছর স্যার আশুতোষের জন্ম। স্যার আশুতোষের রচনাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের বিভ্রাট জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে আরো আছে। অপরদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগারেও অনুরূপ একটি ভৌতিক গ্রন্থের অস্তিত্ব স্যার আশুতোষের নামে বিদ্যমান : 'A text book on Geometrical Conics for Beginners' (ক্যাটালগ নং L 512.1.00 5/3)। কিন্তু গ্রন্থাগারের 'স্ট্যাকে' গ্রন্থটি নেই। ক্যাটালগে গ্রন্থটির প্রকাশক হিসেবে ম্যাকমিলানের নাম উল্লেখ আছে। প্রকাশকাল ১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ। অথচ জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ সংগ্রহ' বিভাগে একই বছরে একই প্রকাশকের অধীনে একই বিষয়ে স্যার আশুতোষের যে গ্রন্থটি রয়েছে, তার নাম 'An elementary treatise on the geometry of conics'. (ক্যাটলগ নং AC. 516·2 M5)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্যার আশুতোষ জানিয়েছেন যে, গ্রন্থটি 'for Beginners'. তিনি আলোচ্য ভূমিকার সূচনায় আরো জানিয়েছেন : "This work contains elementary proofs of the principal properties of conics, and is intended for students who proceed to the subject after finishing the first six books of Euclid". বলা বাহুল্য, ইচ্ছা ছিল প্রতিটি রচনা নিজের চোখে দেখে তবে তা তালিকাভুক্ত করব। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। তবে অত্র বর্ণিত তালিকার ৯৫ শতাংশ রচনা স্বচক্ষে পরখ ক'রে তবে সারণীবদ্ধ করেছি। এবং এই রচনাপঞ্জি প্রণয়নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ সংগ্রহ' বিভাগ হতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের সানুগ্রহ উপদেশনাও সহযোগিতার কথাও বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি।

মা· ভ·]

গ্রন্থনাম (বাংলা)	প্রকাশক	প্রথম প্রকাশকাল
১. জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি (পুস্তিকা)	এন. চ্যাটার্জি	১৯১৬ ইঙ্গাব্দ
২. কৃত্তিবাস (ঐ)	ঐ	ঐ ,,
৩. বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (ঐ)	স্যার আশুতোষ মুখার্জি	ঐ ,,
৪. মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঐ) [২৯ জুন ১৯১৭ ইঙ্গাব্দে পঠিত]	সাথী প্রেস (কলকাতা)-এ মুদ্রিত	১৯১৭ ,,
৫. ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (ঐ) [৬ বৈশাখ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে পঠিত]	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৯১৯ ,,
গ্রন্থনাম (সংস্কৃত)		
৬. জীমূতবাহন (প্রসিদ্ধ বাঙালি স্মৃতিকার জীমূতবাহনের 'ব্যবহার-মাতৃকা' গ্রন্থের সম্পাদনা।)	দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি (বেঙ্গল) প্রকাশনা	১৯১২ ,,
গ্রন্থনাম (ইংরেজি)		
৭. The Law of perpetuities in British India. (১৮৯৮ ইঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ঠাকুর আইন বক্তৃতা।)	Thacker Spink & Co. (Calcutta)	১৯০২ ,,

৮. Annual address (পুস্তিকা) (এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি হিসাবে ৭-২-১৯০৬ তারিখে ১৯০৫ ইঙ্গাব্দের প্রদত্ত ভাষণ।)	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত	১৯০৬ ইঙ্গাব্দ
৯. Annual Address (ঐ) (এশিয়াটিক সোসাইটিতে ২-২-১৯১০ তারিখে ১৯০৯ ইঙ্গাব্দের প্রদত্ত ভাষণ।)	ঐ	১৯১০ ,,
১০. Annual address (ঐ) (এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৫-২-১৯১৩ তারিখে সেই বছরের প্রদত্ত ভাষণ।)	ঐ	১৯১৩ ,,
১১. Address (ঐ) (প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ।)	বিজ্ঞান কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সমিতি প্রকাশিত	১৯১৪ ,,
১২. The History of Indian Museum (ঐ) (যাদুঘরের বক্তৃতা-কক্ষে ২৮ নভেম্বর ১৯১৩ তারিখে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতা।)	যাদুঘরের অছিগণ কর্তৃক প্রকাশিত	ঐ ,,
১৩. Convocation addresses (Vol. IV) (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্তন বক্তৃতামালা ; এই খণ্ডে স্যার আশুতোষের মোট ১৩ খানি ভাষণ সংকলিত : সময়কাল : ১৯০৭-১৯১৪।)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত	ঐ ,,

১৪.	Annual address (পুস্তিকা) (এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৩-২-১৯১৫ তারিখে সেই বছরের প্রদত্ত ভাষণ।)	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত	১৯১৫ বঙ্গাব্দ
১৫.	Addresses : literary and academic	R. Cambray & Co., Calcutta	ঐ ,,
১৬.	Address (পুস্তিকা) (১৯-১০-১৯১৮ তারিখে The University of Mysore-এর প্রথম সমাবর্তনে প্রদত্ত ভাষণ।)	ঐ	১৯১৮ ,,
১৭	The University of Calcutta (ঐ) (২৮-১-১৯২২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ।	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত	১৯২২ ,,
১৮.	The Study of Law (ঐ) (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের Dept. of Legal Studies-এর উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষে ৪-৮-১৯২৩ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ।)	অজ্ঞাত জাতীয় গ্রন্থাগারের 'আশুতোষ-সংগ্রহ' বিভাগে যে কপি আছে, তা off print ; সেখানে প্রকাশনা সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই।)	অজ্ঞাত
১৯.	Democratic Control of University (ঐ) (লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নে ৮-১-১৯২৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ।)	ঐ (ঐ।	ঐ

২০·	The University and the nation (ঐ) (লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ১৭-১-১৯২৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ ।)	ঐ (ঐ)	ঐ
২১·	Historical research in Bihar and and Orissa (ঐ) (বিহার ও ওড়িশার গভর্নর স্যার হেন্‌রি হুইলার-এর সভাপতিত্বে 'বিহার ও ওড়িশা গবেষণা সমিতির'র বার্ষিক সভায় পাটনার গভর্নমেন্ট হাউসে ১৫-৩-১৯২৪ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ ।)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে মুদ্রিত	১৯২৪ ইঙ্গাব্দ
	ভূমিকা-রচনা (ইংরেজি)		
২২·	Foreword. (Capt. J W. Petavel প্রণীত 'Man and Machine Power in War and Reconstruction' গ্রন্থে লিখিত ভূমিকা ।)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত	১৯১৮ ,,
২৩	Outlines of a Scheme for the advanced study of the Indian Vernaculars. (বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'Typical Selections from Oriya Literature' Vol. I-এ সংযোজিত ; এটি ঠিক ভূমিকা নয় ; তবে গ্রন্থে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ; রচনার তারিখ : ২৯-৬-১৯১৮ ।)	ঐ	১৯২১

গণিত বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

২৪.	An elementary treatise on the geometry of conics.	Macmillan & Co., London	১৮৯৩ ইঙ্গাব্দ
২৫.	Arithmetic for Schools (স্যার আশুতোষ এবং শ্যামাচরণ বসু যুগ্মভাবে।)	S. C. Auddy & Co, Calcutta	অজ্ঞাত (১৯২৮ ইঙ্গাব্দে গ্রন্থের ৮ম মুদ্রণ)

গণিত বিষয়ক নিবন্ধ (ইংরেজি)

২৬.	Proof on Euclid I. (পত্রিকায় প্রকাশিত স্যার আশুতোষের এটিই গণিত-বিষয়ক প্রথম নিবন্ধ।)	The Messenger of Mathematics (Cambridge) (দশম বর্ষ, পৃ. ১২২-১২৩)	১৮৮১ ইঙ্গাব্দ
২৭.	Extensions of a theorem of Salmon's. (গণিত-বিষয়ক এটি দ্বিতীয় নিবন্ধ।)	ঐ (ত্রয়োদশ বর্ষ, পৃ. ১৫৭-১৬০)	১৮৮৪ ,,
২৮.	A note on elliptic functions.	Journal of pure and Applied Mathematics (সংখ্যা ৮৩)	১৮৮৬ ,,
২৯.	A memoir on plane analytic geometry (with 3 woodcuts).	Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB). (বর্ষ ৫৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮-৩৪৯)	১৮৮৭ ,,
৩০.	On Monge's differential equation to all conics.	JASB (বর্ষ ৫৬, পৃ. ১৩৪-১৪৫)	ঐ ,,
৩১.	On the differential equation of a trajectory.	JASB (বর্ষ ৫৬, ২য় খণ্ড, সংখ্যা-১)	ঐ ,,

৩২.	A general theorem on the differential equations of trajectories.	JASB (বর্ষ ৫৭, ২য় খণ্ড, সংখ্যা-১)	১৮৮৮ ইস্রাব্দ
৩৩.	On Poisson's Integral (with a woodcnt).	JASB (বর্ষ ৫৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০-১০৬)	ঐ ,,
৩৪.	On the differential equation of all parabolas.	JASB (বর্ষ ৫৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩)	ঐ ,,
৩৫.	Remarks on Monge's Equation.	JASB (Proceedings) (পৃ. ৭৪-৮৬)	ঐ ,,
৩৬.	Elliptic functions and mean values, Part I & II.	JASB (বর্ষ ৫৮, ২য় খণ্ড, সংখ্যা-২	১৮৮৯ ,,
৩৭.	The geometrical interpretation of Monge's differential equation to all conics.	ঐ (ঐ)	ঐ ,,
৩৮.	Mathematical questions and solutions.	The Education Times (Lond.) (বর্ষ ৪৩ পৃ. ১২৫-১৫১ ; বর্ষ ৪৪, পৃ. ১৪৪-১৮২ ; বর্ষ ৪৫, পৃ. ১৪৬-১৬৮)	১৮৯০ ,,
৩৯.	Notes on Stoke's Theorem of hydrokinetic circulation.	JASB (বর্ষ ৫৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬১)	ঐ ,,
৪০.	On a curve of aberrancy.	JASB (বর্ষ ৫৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১-৬৩)	ঐ ,,
৪১.	On Clebsch's Transformation of the hydrokinetic equations.	JASB (বর্ষ ৫৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৯)	ঐ ,,

৪২. Application of Gauss's Theory of curvature to the evalution of double integrals.	অজ্ঞাত (Calcutta Review পত্রিকার জ্বলাই ১৯২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এ. সি. বোসের 'In Memorium' নিবন্ধে উল্লেখ আছে)	অজ্ঞাত
৪৩. On an application of differential equation to the theory of plane cubics.	ঐ (ঐ)	ঐ
৪৪. On some definite integrals.	ঐ (ঐ)	ঐ
৪৫. Researches on the number of normals common to two surfaces, two curves, or a curve and a surface.	ঐ (ঐ)	ঐ
মরণোত্তর প্রকাশনা (ইংরেজি)		
৪৬. Letters of Sir Asutosh. (বড়লাট লর্ড লিটন, তৎকালীন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-আইন সংক্রান্ত আলোচনার চিঠিপত্র সংকলন ।)	Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত	(নভেম্বর) ১৯২৪ ইঙ্গাব্দ
৪৭. Convocation addresses (Vol. V) (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্তন-বক্তৃতামালা ; এই খণ্ডে স্যার আশুতোষের মোট ৪ খানি ভাষণ সংকলিত ; সময়কাল : ১৯২১-১৯২৩ ।)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত	১৯২৫
৪৮, Jatiya Sahitya (ড. শিশিরকুমার দাস অনূদিত 'জাতীয় সাহিত্যে'র ইংরেজি সংস্করণ)	আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিটিউট ও ভারতীয় বিদ্যাভবন যুগ্মভাবে	১৯৯১ ,,

মরণোত্তর প্রকাশনা (বাংলা)

৪৯.	জাতীয় সাহিত্য (বক্ষ্যমান তালিকার ১-৫ সংখ্যক পুস্তিকা এই গ্রন্থে সংকলিত ।)	রমাপ্রসাদ মুখার্জি	১৯৩২ ইঙ্গাব্দ
৫০.	পাটীগণিত ('Arithmatic for Schools'-এর বঙ্গানুবাদ ; গ্রন্থটি আমি চাক্ষুষ করিনি ; শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের মতে, গ্রন্থটি স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ।)	ঐ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে মুদ্রিত)	অজ্ঞাত

মরণোত্তর প্রকাশনা (হিন্দি)

৫১.	জাতীয় সাহিত্য (ড. অবধেশ প্রসাদ সিং অনুদিত 'জাতীয় সাহিত্য'র হিন্দি সংস্করণ)।	আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্‌স্টিটিউট ও ভারতীয় বিদ্যাভবন যুগ্মভাবে	১৯৯১ ইঙ্গাব্দ

সংযোজন (ইংরেজি রচনা)

সং (ক).	The Character of Nepolean Bonapart (১৮৮২ ইঙ্গাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় পঠিত)	অজ্ঞাত	১৮৮২ „
সং (খ).	Si: Issac Newton (১৯৮৮ ইঙ্গাব্দের [ঐ] সভায় পঠিত)	ঐ	১৮৮২ „
সং (গ).	Emerson [Ralph Waldo] (৮।৩।১৮৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত [ঐ] সভায় পঠিত)	ঐ	১৮৮৪ „